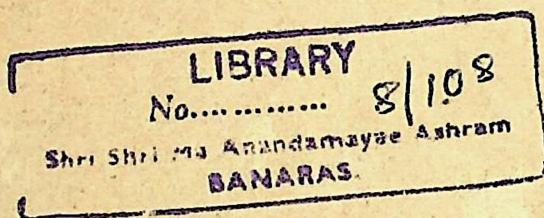
শ্রীশ্রীগৌর-তত্ত্ব



শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য

(কয়েকটী অভিমত)

১। বৈষ্ণবাচার্য্য **শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামী** (নবদ্বীপ। ২৯।১২।৫৩ ইং)। "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক মহারত্ন-কণিকাখানি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ লাভবান্ হইলাম এবং অপার আনন্দও লাভ করিলাম। * * তদীয় কৃপায় সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন লাভ করিয়া এই প্রকারে জীবজগতের মহোপকার সাধনে নিযুক্ত থাকুন, ইহাই প্রার্থনা করি।

২। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব **শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ** (ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা। ১৮।১২।৫৩ ইং)। "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" গ্রন্থখানি পাইয়া কৃতকৃতার্থ ও চমৎকৃত হইলাম। * * শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বিভিন্ন ধারা বৈশিষ্ট্যগুলি * * একত্র সংগ্রহ-পূর্ব্বক বর্ত্তমান এই ত্রিতাপদগ্ধ বিশ্ববাসী আপামর জনে বর্ষণ করিয়া ভক্তহৃদয় স্নিগ্ধ করিলেন। * * প্রভুর করুণাধারা সুনিপুণ ভাবে পরিবেশন করিলেন।

৩। সজ্জনতোষণী-পত্রিকার সম্পাদক **শ্রীল প্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী** (১৯।১২।৫৩ ইং)। "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" গ্রন্থ-খানি দর্শনে ও পঠনে যে কি আনন্দ উপভোগ করিলাম, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

৪। নিষ্কিঞ্চন বনবাসী বৈষ্ণব **শ্রীল হরিচরণদাস বাবাজী মহারাজ** (মথুরা, গোবর্দ্ধন)। "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" গ্রন্থ পাইয়া আনন্দের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি, যাহাতে আমাদের মত জড়ের চৈতন্য দানের কিছু কিছু সাহায্য করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীগৌর-তত্ত্ব

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত

এবং

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের এবং পরে চৌমুহনী কলেজের

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা সম্বলিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

সম্পাদক

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ কর্ত্তৃক

লিখিত

মূল্য—১।॰ টাকা

নিবেদন

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বয়ংভগবত্তা যে শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠিত, তাহাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আলোচনায় যদি গৌর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কাহারও অনুসন্ধিৎসা জাগে এবং যদি কেহ কিছু আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলেই এই অযোগ্য অধম নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে।

কোনও ভগবৎস্বরূপ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারা সহজ ব্যাপার নহে। কেহ কেহ তাঁহাকে উচ্চ অধিকারী সাধক-বিশেষ বলিয়াও মনে করিতে পারেন। আবার, কোনও জীবতত্ত্ব-সাধকের মধ্যে কিছু অলৌকিকী শক্তি দেখিয়াও কেহ কেহ বা তাঁহাকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া মনে করিতে পারেন। বস্তুতঃ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের নির্ভুল পরিচয় দিতে পারে একমাত্র শাস্ত্র ; সুতরাং কেহ ভগবৎ-স্বরূপ কিনা, একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারাই তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

কাহারও ভগবত্তা নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে—শাস্ত্রে এইরূপ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ আছে কিনা, থাকিলে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার কথা শাস্ত্রে আছে কিনা, থাকিলে কোন্ যুগে এবং কি রূপে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, অবতীর্ণ হইয়া কি কি লীলা করিবেন, তৎসমস্তের উল্লেখও শাস্ত্রে আছে কিনা। শাস্ত্রে এই সমস্তের উল্লেখ থাকিলে দেখিতে হইবে—যাঁহার ভগবত্তা নির্ণয় করিতে হইবে, তাঁহাতে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণগুলি আছে কিনা। যদি থাকে এবং যদি ভগবত্তার বিশেষ লক্ষণও তাঁহাতে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই তাঁহাকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এইরূপ বিচার-প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে।

[।৵৹]

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-সেবাপরায়ণ পরমভাগবত শ্রীযুত কানাইলাল সাহা (পি, ১২৬, লেক্ টেরেস্, কলিকাতা-২৯) মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে।

গৌর-গুণমুগ্ধ পরমভাগবত শ্রীযুত অরুণকুমার ঘোষ (২৩, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫) মহাশয় "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" এবং "শ্রীশ্রীগৌর-তত্ত্ব" এই গ্রন্থদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতির কথা জানিয়া অবিলম্বে মুদ্রণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকটে শুনিয়া কলিকাতার স্বনাম-ধন্য চিকিৎসক পরমভাগবত ডাক্তার শ্রীযুত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (৩৩, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) মহাশয় মুদ্রণ-কার্য্যের আনুকূল্যার্থ পাঁচশত টাকা দিবেন বলিয়া ঘোষ-মহাশয়ের যোগে আমাকে জানান। তখন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের সাক্ষাৎ ভাবে কোনও পরিচয় ছিল না। পরে তিনি নিজেই দয়া করিয়া আমার হাতে টাকা দিয়াছেন। তখন পূর্ব্ব গ্রন্থখানির মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ভাবে টাকা দিলেন? সমস্ত গ্রন্থ বিক্রয় হইয়া গেলে খরচ উঠিয়া যাইবে। তখন এই পাঁচশত টাকার কি ব্যবস্থা হইবে? গৌরকথা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের বাসনা প্রভুর কৃপায় এখন পর্য্যন্ত আমার নাই; ভবিষ্যতের কথা প্রভু জানেন।" তখন তিনি বলিলেন—"কিছু গ্রন্থ দিয়া দিবেন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিব।"

শ্রীযুত ঘোষ মহাশয়ের এবং শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌর-প্রীতি এবং গৌর-কথা প্রচারে আগ্রহ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। সাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের গৌর-প্রীতির অমর্য্যাদা করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি;

আর, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাধারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিষিঞ্চিত করুক—ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবন দাবানলকুণ্ডাশ্রয়ী গৌরগতপ্রাণ পরম ভাগবত শ্রীশ্রীহরিবাবা মহারাজ এই গ্রন্থ-প্রকাশের আনুকূল্যার্থ অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সম্প্রতি একশত টাকা পাঠাইয়া দিয়া এই অধমকে স্নেহ-কৃপাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সঙ্গে কোনওরূপ আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে আমার হয় নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কখন কি ভাবে তাঁহার করুণা প্রকাশ করেন, তাহা তিনিই জানেন।

গৌরগত-প্রাণ ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জানাইয়া প্রার্থনা করিতেছি—তাঁহারা যেন নিজগুণে কৃপা করিয়া এই অযোগ্য অধমের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ নমঃ॥

২৯শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৬০ — ভক্তপদ-রজঃপ্রার্থী
শুক্লাদশমী — **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**

—※—

প্রকাশক ঃ
ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডারের পক্ষে
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
৪৬, রসা রোড্ ইষ্ট্ ফাষ্ট´ লেন,
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনরেন্দ্রকুমার নাগ রায়
ইষ্টল্যাণ্ড প্রিণ্টার্স
১, গঙ্গাপ্রসাদ লেন, কুমারটুলি,
কলিকাতা-৫

সূচীপত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক

সূচীপত্র সমাপ্ত

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্!
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

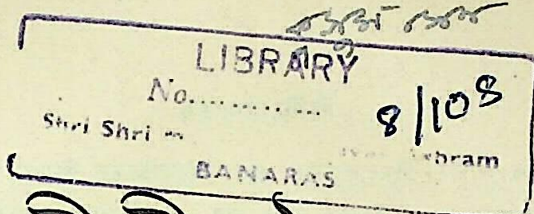
———•———

জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ।

———•———

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যে রচিল চৈতন্যচরিত।
তাঁহার চরণপদ্ম, সকল মঙ্গল-সদ্ম,
বন্দো মুঞি অধম পতিত ॥

———



শ্রীশ্রীগৌর-তত্ত্ব

বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর স্বরূপসম্বন্ধে নীলাচলে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের আলোচনা হইতেছিল। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-সম্বন্ধে গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন—

ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।

—শ্রীচৈ, চ, ২।৬।৭৭-৭৮

—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতেই ভগবত্তার লক্ষণসমূহের চরম বিকাশ; সুতরাং ইনি পরম-ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্।

গোপীনাথ আচার্য্যের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের শিষ্যগণ বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে "ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে ?" তখন গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন —

—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৬।৭৯

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ঈশ্বর—স্বয়ংভগবান্—বিজ্ঞমতই তাহার প্রমাণ।

প্রশ্ন হইতে পারে—"বিজ্ঞমত" বলিতে গোপীনাথ আচার্য্য কাহার মতকে লক্ষ্য করিয়াছেন ?

গোপীনাথ আচার্য্যের পরবর্ত্তী বাক্য হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ উল্লেখ করিতে যাইয়া

গোপীনাথ আচার্য। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাভারতের কয়েকটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, গোপীনাথ আচার্য্যের মতে শাস্ত্রবাক্যই "বিজ্ঞমত", সুতরাং শাস্ত্রই "বিজ্ঞ।" সাধারণতঃ মনে হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষই "বিজ্ঞ" নামে অভিহিত হইতে পারেন ; শাস্ত্র হইল গ্রন্থবিশেষ ; শাস্ত্রকে কিরূপে "বিজ্ঞ" বলা যায় ? কিন্তু বহুজ্ঞানের আধার বলিয়া প্রাচীন আচার্য্যগণ শাস্ত্রকেও "সর্ব্বজ্ঞ" বলিয়া গিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১।১।৩ ॥"-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রকে "সর্ব্বজ্ঞকল্প" বলিয়াছেন। "মহত ঋগ্‌বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেক-বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।" যিনি সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞকল্প, তাঁহাকে "বিজ্ঞ" বলা অসঙ্গত হয় না ; সুতরাং শাস্ত্রকেও "বিজ্ঞ" বলা যায় এবং শাস্ত্রের মতকে "বিজ্ঞমত" বলা যায়।

"বিজ্ঞমত"-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। শাস্ত্রের যে বাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়, সেই বাক্যটী যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহাকেও "বিজ্ঞ" বলা যায় এবং তাঁহার বাক্যে যে মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকেও "বিজ্ঞমত" বলা যায়। এক্ষণে দেখিতে হইবে—শাস্ত্র কাহার বাক্য বহন করিতেছেন ?

শ্রুতি হইতে জানা যায়—চারিবেদ, উপনিষদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ এই সমস্তই পরব্রহ্মের নিশ্বাস। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্‌ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যোপনিষদঃ শ্লোকাঃ॥ মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ॥ ৬।৩২॥" বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিশ্বাস বলিয়া তাঁহারই বাক্য, অপৌরুষেয়-বাক্য। পরব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ "বিজ্ঞ" এবং তাঁহার বাক্যরূপ-শাস্ত্রাদিতে যে মত প্রকটিত

হইয়াছে, তাহাই "বিজ্ঞমত।" ইহা হইতেও জানা গেল—শাস্ত্রমতই "বিজ্ঞমত।" শাস্ত্র ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষও থাকিতে পারে না।

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৭।১০২

অপৌরুষেয় বেদাদি-শাস্ত্রে ভগবান্ যে সকল তত্ত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, কোনও কোনও ঋষি সেই সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে কোনও কোনও তত্ত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবের কল্যাণার্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে-সমস্ত ঋষির নামেই শাস্ত্রাদিতে সে-সমস্ত তত্ত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত ঋষিদিগকেও "বিজ্ঞ" বলা যায় এবং তাঁহাদের নামে যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত বাক্যে অভিব্যক্ত মতকেও "বিজ্ঞমত" বলা যায়। এই সমস্ত বাক্যেও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না।

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।২।৭২

ইহা হইতেও জানা যায়—**শাস্ত্রমতই বিজ্ঞমত।**

বিজ্ঞমতের উদাহরণে গোপীনাথ আচার্য্য যখন কেবল শাস্ত্রবাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কোনও ব্যক্তিবিশেষের মতের উল্লেখ করেন নাই, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্রমতই একমাত্র "বিজ্ঞমত", ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—অপৌরুষেয় শাস্ত্রের সঙ্গে ঋষিদিগের মতের পার্থক্য নাই বলিয়া ঋষিদিগের মতও বিজ্ঞমত। তাহাতেও ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শাস্ত্রমতই একমাত্র বিজ্ঞমত।

বিজ্ঞ-শব্দের তাৎপর্য্য কি, এক্ষণে তাহা বিবেচনা করা যাউক।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান যেমন দুইটী বস্তু, "জ্ঞ" এবং "বিজ্ঞও" তেমনি দুইটী বস্তু। যিনি জ্ঞান লাভ করেন, তিনি "জ্ঞ" এবং যিনি বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি "বিজ্ঞ।"

কিন্তু "জ্ঞান" এবং "বিজ্ঞান" বলিতে কি বুঝায়? পরোক্ষ অনুভূতির নাম জ্ঞান এবং অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভূতির নাম বিজ্ঞান। যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, পুস্তক হইতে বা অপরের মুখ হইতে বরফের স্বরূপ এবং গুণাদি-সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে পারেন, তাহা হইতেছে বরফ-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান। আর বরফ হাতে পাইয়া, তাহা অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া বা মুখে দিয়া বরফ-সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে পারেন, তাহা হইতেছে বরফ-সম্বন্ধে তাঁহার বিজ্ঞান। জ্ঞান হইতেছে শব্দদ্বারা নির্দ্ধারণ; আর বিজ্ঞান হইতেছে সাক্ষাদ্ ভাবে অনুভব।

ব্রহ্মার নিকটে চতুঃশ্লোকীতে স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশের উপক্রমে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

—শ্রীভা, ২।৯।৩০

—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—আমার সম্বন্ধে পরমগুহ্য যে জ্ঞান, বিজ্ঞানের সহিত, তাহার রহস্যের সহিত এবং তাহার অঙ্গের সহিত, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

ইহার পরেই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আবার বলিলেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

—শ্রীভা, ২।৯।৩১

—আমার যে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, আমার যে সকল রূপ, গুণ এবং কর্ম্ম (লীলা) আছে, আমার অনুগ্রহে তৎসমস্তের বিজ্ঞান (যথার্থ অনুভব) তোমার হউক।

ইহা হইতে জানা গেল, ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থ অনুভব বা বিজ্ঞান—ব্রহ্মার পক্ষেও দুর্ল্লভ, অন্য জীবের কথা তো দূরে। ভগবত্তত্ত্বাদি হইতেছে স্বপ্রকাশ বস্তু ; ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার নিকটে তাহা প্রকাশ করেন, তিনিই তাহা জানিতে পারেন, অপরে তাহা জানিতে পারে না। শ্রুতিও একথাই বলেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমৈবেষ বৃণুতে তেন এষ লভ্য
স্তস্যৈষ বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

বিজ্ঞানের কথা তো দূরে, ভগবত্তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে জ্ঞানও (পরোক্ষ অনুভবও) তাঁহার কৃপা ব্যতীত হইতে পারে না। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্রাদির আলোচনা করা যাইতে পারে, সত্য ; কিন্তু ভগবৎ-কৃপা না হইলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না ; শিবের সন্ধানে বাহির হইয়া হয়তো বানর লইয়াই ঘরে ফিরিতে হইবে।

দিগ্‌ভ্রান্ত লোক দক্ষিণদিক্‌কেও হয়তো পূর্ব্বদিক্ বলিয়া মনে করিতে পারেন ; ইহা যে তাঁহার ভ্রম, সূর্য্যোদয় দেখিলে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু বিচারের দ্বারা তাঁহার অনুভব ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলেও তাঁহার ধারণাটী সহজে দূর হয় না ; সূর্য্য যাহাকে দক্ষিণ দিক্ বলিয়া জানাইয়া দিয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বদিক্, এই ধারণাই অনেক সময় তাঁহার মনে থাকিয়া যায়। তবে কার্য্যকালে তাঁহাকে সূর্য্যের নির্দ্দেশ অনুসারেই চলিতে হয় ; নচেৎ অনেক বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হয়।

দিগভ্রান্ত লোকের দিক্‌সম্বন্ধীয় অনুভব যথার্থ কিনা, তাহা যেমন সূর্য্যোদয়দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, তদ্রূপ পরমার্থ-বিষয়ে কোনও সাধকের অনুভব যথার্থ কিনা, তাহাও শাস্ত্রদ্বারাই নির্ণয় করিতে হইবে ; যেহেতু, পরমার্থ-বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"-সূত্রে বেদান্তও একথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-বিষয়ে শাস্ত্রই যে একমাত্র প্রমাণ, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"-সূত্রেও বেদান্ত তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন। "অথবা যথোক্তম্ ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণম্ অস্য ব্রহ্মণো যথাবৎ স্বরূপাধিগমে।—ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান-বিষয়ে ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রই প্রমাণ।" সুতরাং যাঁহার অনুভবের সঙ্গে শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি আছে, তাঁহার অনুভবই যথার্থ অনুভব এবং পরমার্থ-বিষয়ে তাঁহার অনুভবলব্ধ মতকেই বিজ্ঞমত বলা যায়। যদি তাঁহার অনুভবের সহিত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে তাহা যথার্থ অনুভব হইবেনা ; তাহা হইবে ভ্রান্তিমাত্র।

এই আলোচনা হইতেও জানা গেল, ভগবত্তত্ত্বাদি সম্বন্ধে **শাস্ত্রের মতই বিজ্ঞমত** অর্থাৎ বিজ্ঞমতের সহিত শাস্ত্রমতের বিরোধ নাই।

সাধনের প্রভাবে কোনও কোনও সাধক অণিমা-লঘিমাদি অনেক অলৌকিকী শক্তি লাভ করিতে পারেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে জানা যায়, কৃষ্ণভক্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোনও কোনও গুণও বিন্দু-বিন্দু-পরিমাণে আবির্ভূত হইতে পারে। "জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু-বিন্দুতয়া কচিৎ ॥ ২।১।১২॥" কিন্তু এইরূপ অলৌকিকী শক্তি বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও গুণের কিঞ্চিৎ আবির্ভাব কোনও সাধকে দৃষ্ট হইলেও তিনি জীবতত্ত্বই ; তাহাতে তিনি ভগবান্ হইয়া যায়েন না। অলৌকিকী শক্তি বা অলৌকিক গুণই ভগবত্তার একমাত্র প্রমাণ বা বিশেষ লক্ষণ

নয়। এতাদৃশ গুণ-শক্তিসম্পন্ন কোনও সাধককে যদি কেহ ভগবান্ বলিয়া অনুভব করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অনুভবকে বিজ্ঞের অনুভব বা যথার্থ অনুভব বলা যাইবে না। বিজ্ঞের অনুভবকে বিদ্বদনুভবও বলা হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হইবে—যদি তাহা উল্লিখিতরূপ "বিজ্ঞমত" হয়, বিদ্বদনুভবলব্ধ তত্ত্ব হয়; অর্থাৎ যদি তাহা সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যদের উক্তিরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি।

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী গৌরতত্ত্বের পরিচায়ক নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

—শ্রীরাধিকা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিকার-(গাঢ়তম অবস্থা-) স্বরূপা; সুতরাং শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ) তাঁহারা (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন একাত্মা; কিন্তু একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে তাঁহারা

গোলোকে পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে (কলিযুগে) সেই দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য-নামে প্রকট হইয়াছেন। সেই রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।

এস্থলে এই শ্লোকের একটু আলোচনা করা হইতেছে। শ্লোকে হ্লাদিনীকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলা হইয়াছে ; তাই শক্তির কথা নিয়াই আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় এবং গোপালতাপনী-আদি শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মের অনন্তশক্তি আছে এবং তাঁহার শক্তি স্বাভাবিকী।

পরাঽস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

স্বাভাবিকী-শব্দে অবিচ্ছেদ্যত্ব বুঝায়। দাহিকাশক্তি হইতেছে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি ; অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। গন্ধও হইতেছে মৃগমদের স্বাভাবিকী শক্তি ; মৃগমদ হইতে তাহার গন্ধকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তদ্রূপ, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তাঁহার শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; এজন্যই তাঁহার শক্তিকে স্বাভাবিকী বলা হইয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আগুনের মধ্যে রাখিয়া দিলে লৌহও দাহিকা শক্তি লাভ করে ; ইহা লৌহের স্বাভাবিকী শক্তি নহে ; আগুনে দেওয়ার পূর্ব্বে লৌহের দাহিকাশক্তি ছিলনা, আগুন হইতে সরাইয়া আনিলেও কতক্ষণপরে লৌহের দাহিকাশক্তি থাকে না। এই দাহিকা শক্তি আগুন হইতেই লৌহে সঞ্চারিত হয়, পরে তিরোহিত হইয়া যায় ; ইহা হইতেছে লৌহের আগন্তুকী শক্তি এবং ইহা সাময়িকী। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এইরূপ আগন্তুকীও নহে, সাময়িকীও নহে। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নিত্য এবং স্বাভাবিকী।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি হইতেছে চেতনাময়ী-শক্তি—জড়শক্তির বিরোধী ; আর মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা শক্তি—চিদ্‌বিরোধী। আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ সম্বন্ধ, চিচ্ছক্তি ও জড়-মায়াশক্তির মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধ ; চিচ্ছক্তি আলোক-স্বরূপা এবং মায়াশক্তি অন্ধকারস্বরূপা। যেখানে আলোক, সেখানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারেনা, তদ্রূপ যেস্থলে চিচ্ছক্তি বা সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌, সেস্থলেও মায়াশক্তি থাকিতে পারে না। মায়াশক্তি ভগবান্ হইতে বাহিরে থাকে বলিয়া ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয়।

চিচ্ছক্তি পরব্রহ্মের বা স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে এবং জড়-বিরোধী বলিয়া ইহাকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে পার্থক্যসূচনার্থ। উল্লিখিত তিনটী শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে পরাশক্তিও বলা হয়।

জীবশক্তিও চিদ্রূপা। মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি ভগবানের মধ্যে থাকে না। তথাপি, ভগবান্‌ই তাহাদের অস্তিত্বের মূল বলিয়া এবং ভগবান্ কর্ত্তৃকই তাহারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ভগবানের সহিত তাহাদেরও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ; তাহারাও ভগবানের স্বাভাবিকী শক্তি। চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশই জীব ; অবস্থা-বিশেষে জীব চিন্ময় ভগবদ্ধামে যাইতে বা থাকিতে পারে ; কিন্তু মায়াশক্তি কখনও চিন্ময় ভগবদ্ধামে যাইতে পারেনা। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াশক্তির কার্য্যস্থল।

স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনীশক্তি, সম্বিৎশক্তি এবং হ্লাদিনী-শক্তি। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সৎ-চিৎ-আনন্দময়। তাঁহার সৎ-অংশের শক্তিকে বলে সন্ধিনী শক্তি বা সত্ত্বাসম্বন্ধিনী শক্তি ; সন্ধিনীদ্বারা ভগবান্ নিজের

এবং অপর সকলের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। ভগবদ্ধামাদিও সন্ধিনী শক্তিরই বিলাস ; এজন্য ইহাকে আধার-শক্তিও বলা হয়। তাঁহার চিৎ-অংশের শক্তিকে বলে সম্বিৎ-শক্তি ; ইহা জ্ঞানময়ী শক্তি ; এই সম্বিৎ শক্তিদ্বারা ভগবান্ নিজে জানেন এবং অপরকেও জানান। আর, তাঁহার আনন্দাংশের শক্তিকে বলে হ্লাদিনী (বা আনন্দদায়িনী) শক্তি। এই হ্লাদিনীদ্বারা ভগবান্ নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ দান করেন। "স আনন্দায়তি। শ্রুতি।"

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই তিনটী শক্তিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; যেহেতু, তাহারা একই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। যেস্থলে ইহাদের কোনও একটী থাকিবে. সেস্থলে অপর দুইটীও থাকিবেই ; তবে তাহাদের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে। যখন স্বরূপ-শক্তিতে সন্ধিনীর প্রাধান্য অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তি বলা হয়। স্বরূপ-শক্তিকে শুদ্ধসত্ত্বও বলা হয় ; সুতরাং সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিকে সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বও বলা হয় ; সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে সাধারণতঃ কেবল সন্ধিনী শক্তিও বলা হয়। এইরূপে সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তিকে (বা সম্বিৎ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে) সাধারণতঃ কেবল সম্বিৎ-শক্তি এবং হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিকে সাধারণতঃ কেবল হ্লাদিনী শক্তিও বলা হয়।

উপরে উদ্ধৃত স্বরূপ-দামোদরের শ্লোকে হ্লাদিনী-শব্দে হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝাইতেছে।

কৃষ্ণ-প্রণয়-শব্দে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে বুঝায়—যেই প্রেমের বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, সেই প্রেম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাকে বলে প্রেম—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম ; ইহাতে স্বসুখ-বাসনার বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই। ইহা প্রাকৃত

মনের বৃত্তি নহে ; বস্তুতঃ প্রেম হইতেছে হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির (বা হ্লাদিনীর) বৃত্তি-বিশেষ। শ্লোকস্থ বিকৃতি-শব্দে বিকার বুঝায়। দুগ্ধের বিকার যেমন ক্ষীর, সেই রকম বিকার—ঘনীভূত অবস্থা। শ্রীরাধা হইতেছেন—কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। তাহা কিরূপ, কবিরাজগোস্বামী তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৫৯-৬০

—হ্লাদিনীর ঘনীভূত অবস্থার নাম প্রেম। প্রেম ঘনীভূত বা গাঢ় হইতে হইতে কয়েকটী স্তর অতিক্রম করিয়া যায় ; প্রেমের প্রথম গাঢ় অবস্থার নাম স্নেহ ; স্নেহও ঘনীভূত হইতে হইতে ক্রমশঃ মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব নাম প্রাপ্ত হয়। মহাভাবও আবার গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোদন ও মাদন নামে অভিহিত হয়। মাদনাখ্য মহাভাবই হইল সর্ব্বোচ্চতম স্তর। তাহা হইলে দেখা গেল, প্রেমের বিশেষরূপে গাঢ় অবস্থার নাম হইল ভাব—"প্রেমসার ভাব" ; আবার ভাবেরও চরম গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত স্তরের নাম হইল মহাভাব—"ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব"। পরম-কাষ্ঠা-শব্দে ভাবের চরমতম-বিকাশ বা গাঢ়তম স্তর মাদনাখ্য-মহাভাবকেই বুঝাইতেছে ; যেহেতু, কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তরের নাম মাদন—মাদনাখ্য মহাভাব ; ইহাতেই প্রেমবিকাশের পরাকাষ্ঠা। প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া মাদনাখ্য মহাভাব পর্য্যন্ত—প্রেমের এই সমস্ত স্তরই যখন স্বরূপতঃ হ্লাদিনীরই গাঢ়ত্ব-প্রাপ্ত বিভিন্ন স্তর, তখন সমস্ত স্তরই—সুতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবও—হইতেছে স্বরূপতঃ

হ্লাদিনীই। শ্রীরাধা হইতেছেন এই মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপা ; সুতরাং শ্রীরাধাও হইতেছেন স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধা হইলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ ; তিনি কিরূপে হ্লাদিনী শক্তি হইতে পারেন? উত্তরে বলা যায়, শক্তির দুই রূপে অবস্থিতি—কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত ; আর শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। শ্রীরাধা হইতেছেন—শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, মহাভাবরূপ হ্লাদিনী-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ এবং মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রী ; শ্রীরাধাই মূর্ত্ত মাদনাখ্য-মহাভাব ; মাদনাখ্য মহাভাবের সমস্ত প্রভাব এবং মহিমা শ্রীরাধাতেই বিরাজিত। এজন্যই বলা হইয়াছে—"মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী"। এপর্য্যন্ত শ্লোকস্থ "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী"-অংশের অর্থ করা হইল।

এক্ষণে শ্লোকস্থ "অস্মাৎ তৌ একাত্মানৌ"-অংশের অর্থালোচনা করা হইতেছে। অস্মাৎ—এই হেতু ; শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া। তৌ—তাঁহারা দুই জন, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই জন। একাত্মানৌ—একই স্বরূপ। শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ থাকিতে পারেনা ; শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়া একই বস্তু বা একই স্বরূপ-রূপে অবস্থিত থাকে ; যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি একত্রেই অবস্থান করে। তদ্রূপ, শ্রীরাধা শক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহারা উভয়ে একই স্বরূপ—একাত্মা।

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তারগন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।

শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৮৩-৮৫

কিন্তু "একাত্মানৌ অপি"—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপ হইলেও "ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ"—পুরা (অনাদি কালেই) ভুবি (তাঁহাদের নিত্যলীলাস্থল গোলোকে) তৌ (তাঁহারা—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) দেহভেদং গতৌ (ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, এই দুই রূপে—বিরাজিত)। একই স্বরূপ হইয়াও কেন তাঁহারা অনাদিকাল হইতে দুই দেহে বিরাজিত? রস-আস্বাদনের নিমিত্ত।

শ্রুতিতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রস-স্বরূপ বলা হইয়াছে, "রসো বৈ সঃ।" রস-শব্দের দুইটী অর্থ—রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ, আর, রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ। যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহাও রস; আর যিনি আস্বাদন করেন, তিনিও রস—রস-আস্বাদক, রসিক। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ "রসস্বরূপ" বলিয়া পরম আস্বাদ্য এবং পরম আস্বাদকও। তিনি আস্বাদন করেন ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস; প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হয় লীলাতে। লীলা অর্থ ক্রীড়া, খেলা। ক্রীড়া একাকী হয় না, ক্রীড়ার সঙ্গী চাই। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"স একাকী ন রমতে। মহোপনিষৎ॥" লীলারস আস্বাদনের জন্যই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে দুই হইলেন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ; তাহাও অনাদিকালে। রস আস্বাদনের জন্য অনাদি কাল হইতেই তিনি এই দুই রূপে বিরাজিত।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৪৯,৮৫

লীলারস আস্বাদনের জন্য রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে দুই হইয়াছেন, তাহা নহে; এই দুইই আবার বহুও হইয়াছেন। শ্রুতি তাঁহাকে "সর্ব্বরসঃ"—অখিল-রসামৃত-বারিধি বলিয়াছেন। তিনি "সর্ব্ব-রসঃ" বলিয়া সমস্ত রস-বৈচিত্রীই তাঁহাতে বর্ত্তমান; বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের জন্য রসিকশেখর নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপেও অনাদি কাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী যেমন তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত, তাহাদের মূর্ত্তরূপ বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপও তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত। তিনি "একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৯।১৪১॥" শ্রুতি বলিয়াছেন—"একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি॥ গোপাল-তাপনী।" আর, শ্রীরাধাও তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। ব্রজের অনন্ত কৃষ্ণ-কান্তা গোপসুন্দরীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ সকলেই শ্রীরাধার বিভিন্ন রূপবিশেষ।

যাহা হউক, লীলারস আস্বাদনের জন্য একই তত্ত্ব যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুই রূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছেন, সেই দুইই—শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণই—আবার ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে এই কলিতে প্রকটিত হইয়াছেন। "চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্।" শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া এক স্বরূপ হইয়া শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন। ইহাও অবশ্য অনাদিকালে; এই কলিতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়াছেন মাত্র।

সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৫০

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একই তত্ত্ব "লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৮৫ ॥"; আবার এস্থলে বলা হইল—"রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একরূপ।" ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই—এক জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য দুই হইয়াছেন; আর এক জাতীয় রস আস্বাদনের জন্য দুইই আবার এক হইয়াছেন।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই রূপে যে লীলা, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, শ্রীরাধার প্রেমের বিষয়মাত্র, আর শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমের আশ্রয়। এই লীলাতে প্রেমের বিষয়রূপেই শ্রীকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করেন; শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয়রূপে যে রসের আস্বাদন পাওয়া যায়, এই লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ সেই রসের আস্বাদন পায়েন না। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহ। আর শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ঐক্যবশতঃ শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য হইতেছেন শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয়-প্রধানস্বরূপ। এই স্বরূপে তিনি রাধাপ্রেমের আশ্রয়রূপে রস আস্বাদন করেন। প্রেমের বিষয়রূপে আস্বাদনীয় রস এবং প্রেমের আশ্রয়রূপে আস্বাদনীয় রস—এই দুই বস্তু হইল ভিন্ন জাতীয়। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়রূপে রস আস্বাদন করেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলায়; আর আশ্রয়রূপে রস আস্বাদন করেন শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপ-লীলায়। পরবর্ত্তী আলোচনায় এই বিষয়টী আরও পরিস্ফুট হইবে।

যাহা হউক, শ্লোকে বলা হইয়াছে—শ্রীচৈতন্য হইতেছেন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ঐক্যপ্রাপ্ত-স্বরূপ। কিন্তু আবার তাঁহাকে "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" বলা হইল কেন? "রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" বলিলে মনে হয়, শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন—উভয়ের ঐক্যপ্রাপ্তির কথা যেন তাহাতে থাকে না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

"রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত"-শব্দেই শ্রীরাধার সহিত ঐক্যপ্রাপ্তি সূচিত হইতেছে ; যেহেতু, ঐক্যপ্রাপ্ত না হইলে শ্রীরাধার ভাব (প্রেম) এবং দ্যুতি (কান্তি) গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে না। তাহার হেতু এই। বস্তুতঃ ভাবই স্বরূপের বৈশিষ্ট্য। স্বরূপ হইল ভাবেরই মূর্ত্ত রূপ। একই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। একই শ্রীরাধা কেবল ভাবভেদেই বিভিন্ন কান্তাশক্তি রূপে বিরাজিত। ভাবকে বাদ দিয়া স্বরূপের কল্পনা করাও চলে না। স্বরূপকে বাদ দিয়া ভাবকেও গ্রহণ করা চলে না। স্বরূপকে গ্রহণ করিলেই স্বরূপের ভাব এবং কান্তিকেও গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। স্বরূপকে বাদ দিয়া যদি কেবল ভাবগ্রহণ সম্ভব হইত, তাহা হইলে ব্রজলীলাতেই শ্রীরাধার পৃথক্ সত্ত্বা রক্ষা করিয়াও তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় রস আস্বাদন করিতে পারিতেন। তাহাতে এক ব্রজেই বিষয়জাতীয় এবং আশ্রয়জাতীয়—এই উভয়জাতীয় রসই আস্বাদন করা সম্ভব হইত। তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই শ্রীরাধার ভাব (প্রেম) গ্রহণের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া এক হইতে হইয়াছে। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গৌরকান্তিদ্বারাও সুবলিত হইয়াছেন। শ্রীরাধা স্বীয় গৌর অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যেন সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। হৃদয়ে শ্রীরাধার ভাব লইয়া এবং অঙ্গে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাদ্বারা আচ্ছাদিত বা আলিঙ্গিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন।

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত"-শব্দে ইহাও সূচিত হইতেছে যে—শ্রীচৈতন্যের বর্ণ গৌর ; তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর।

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত"-শব্দের আর একটী ব্যঞ্জনাও আছে ; তাহা হইতেছে এই। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ; শক্তির স্বরূপানুবন্ধী

কর্ত্তব্য হইতেছে শক্তিমানের সেবা। শ্রীরাধার কর্ত্তব্যও হইতেছে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা। শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ সেবাই তিনি করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকানাম পুরাণে বাখানে॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৭৫

সুতরাং শ্রীরাধা হইলেন ভক্তভাবময়ী। তাঁহার ভাবও হইল ভক্তভাব। এতাদৃশী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যও ভক্তভাবময়; স্বয়ং-ভগবান্ হইয়াও তিনি ভক্তভাবময়—ইহাও "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত"-শব্দের একটী ব্যঞ্জনা।

শ্লোকস্থ "শ্রীচৈতন্য" শব্দেরও একটী ব্যঞ্জনা আছে বলিয়া মনে হয়। "শ্রীচৈতন্য"-শব্দ হইতেছে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ শ্রীচৈতন্য যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, "শ্রীচৈতন্য" শব্দে তাহাই যেন ধ্বনিত হইতেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন দুই পৃথক্ স্বরূপ। তাঁহারা কিরূপে মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইলেন?

মূল শ্লোকেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি হইলে তাহাদের দেহের ঐক্য সম্ভব হইতে পারেনা, এক জনের ভাবও অপরের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর হইতে ভিন্ন নহেন; শ্লোকে বলা হইয়াছে—তাঁহারা "একাত্মা" —একই স্বরূপ; একই স্বরূপ বলিয়াই তাঁহাদের ঐক্য সম্ভব হইয়াছে।

যাহা হউক, "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লিখিত আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই—

(১) শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; তিনি প্রেমঘন-বিগ্রহা; (২) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা; (৩) একাত্মা হইয়াও এক জাতীয় রসের আস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতে তাঁহারা গোলোকে দুই রূপে বিরাজিত; (৪) আর এক জাতীয় রসের আস্বাদনের জন্য তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া একই বিগ্রহে শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন; (৫) শ্রীচৈতন্য রাধাভাব-কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ; (৬) শ্রীচৈতন্যের বর্ণ শ্রীরাধার বর্ণের ন্যায় গৌর; (৭) শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল, "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রাকারে গৌরতত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই শ্লোকটি শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে কবিরাজ-গোস্বামী নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাই এই শ্লোকে গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের উক্তি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর যাহা বলিলেন, তাহা কি তাঁহার নিজস্ব অভিমত, না কি ইহার কোনও শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে। যদি ইহা তাঁহার নিজস্ব অভিমত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ তাহা গ্রহণ করিবেন কিনা সন্দেহ। কোনও মহাপুরুষকে ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্যও চালাইয়া যাওয়া হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার ভগবত্তাসম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ না থাকিলে ঐরূপ চেষ্টা ও প্রচারের বিশেষ কোনও মূল্য থাকিতে পারে না। "রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীপাদস্বরূপদামোদর যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে—শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে কিনা :—

(ক) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ; শ্রীরাধা প্রেমঘন-বিগ্রহা।

(খ) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা।

(গ) একাত্মা হইয়াও শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই দুই রূপে অবস্থিত এবং লীলায় বিলসিত।

(ঘ) গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের অস্তিত্বের কথা।

(ঙ) সেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের একত্ব প্রাপ্ত স্বরূপ।

(চ) গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা শাস্ত্রে থাকিলেও তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন কিনা, হইলে কোন্ যুগে অবতীর্ণ হয়েন।

(ছ) স্বয়ংভগবানের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শাস্ত্রে আছে কি না।

(জ) গৌরবর্ণ ভগবানের ভক্তভাবের কথা শাস্ত্রে আছে কিনা।

(ঝ) গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা এবং ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণের কথা শাস্ত্রে থাকিলেও শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবই যে সেই গৌরবর্ণ স্বয়ং-ভগবান্, তাহারই বা প্রমাণ কি ?

এক্ষণে এ-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে। এই আলোচনায় দেখা যাইবে, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রোক্তিরই সারমর্ম্ম ; ইহা তাঁহার নিজস্ব অভিমত নহে।

———

শ্রীরাধার কৃষ্ণশক্তিত্ব ও প্রেমঘন-বিগ্রহত্ব

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

—ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৭

—ব্রহ্মা বলিতেছেন, "অখিলাত্মভূত (সকলের পরম প্রিয়) যে গোবিন্দ—আনন্দচিন্ময়-রসদ্বারা প্রতিভাবিতা, স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা, স্বীয় স্বরূপশক্তি-হ্লাদিনী-স্বরূপা ব্রজদেবীগণের সহিত গোলোকে বাস করিতেছেন—সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিশেষ বিশেষ শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই। আনন্দ-চিন্ময়রসঃ—পরম-প্রেমময় উজ্জ্বল-নামা—পরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত উজ্জ্বল রস (অর্থাৎ কান্তারস); কান্তা-প্রেম—মহাভাব। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"আনন্দ-চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥ ২।৮।১২২ ॥" অর্থাৎ প্রেমেরই একটী প্রতিশব্দ হইতেছে "আনন্দচিন্ময়রস।" নিজরূপতয়া—স্বদারত্বেনৈব—স্বীয় কান্তারূপে। শ্রুতিও বলেন—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব সঃ। —শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিত্য-পতি।" কলাভিঃ—হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ; সেই কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ হইতেছেন হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিরূপা।

উল্লিখিত শ্লোকে ব্রহ্মা বলিলেন, শ্রীগোবিন্দ স্বীয় নিত্যকান্তা গোপসুন্দরীদিগের সহিত গোলোকে বিরাজিত; গোপসুন্দরীগণ—

সুতরাং শ্রীরাধাও—হইতেছেন হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপা এবং তাঁহারা "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা", প্রেম-বিভাবিতা। বিভাবিত-শব্দের দুইটী অর্থ হয়—গঠিত এবং বিশেষরূপে ভাবিত (পানের বা ঘৃত-কমলের রসে বটীকা যেমন ভাবিত হয়, তদ্রূপ)। তাহা হইলে গোপসুন্দরীগণ হইতেছেন—প্রেমদ্বারা গঠিতা, প্রেমঘন-বিগ্রহা এবং তাঁহাদের দেহও প্রেমরসের দ্বারা বিশেষরূপে ভাবিত, তাঁহাদের দেহের প্রতি অণু-পরমাণু প্রেমরসে পরিনিষিক্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—"প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমবিভাবিত ॥ ২।৮।১২৪ ॥"

এইরূপে ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণে জানা গেল—শ্রীরাধিকাদি গোপ-সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা এবং প্রেম-ঘন-বিগ্রহা।

উজ্জ্বলনীলমণিও বলিয়াছেন—শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপা।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥

—শ্রীরাধাপ্রকরণ। ২

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায় ॥

—১।৪।৬১

শ্রীরাধিকাদি যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ ॥"—"স্মরতি চ"—এই ২।৩।৪৫ বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে এবং সিদ্ধান্তরত্ন-গ্রন্থের ২।২২ অনুচ্ছেদে ধৃত অথর্ব্ব-বেদান্তর্গত পুরুষ-বোধিনী-শ্রুতি-বচন।

শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন—

—রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মী-স্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদ-স্বরূপিণী॥
ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ॥

—৫০।৫৩-৪

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রও বলেন—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতা

পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ড হইতে জানা যায়, শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন :—

রাধিকা পরদেবতা।

* * * *

সা তু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণোনারায়ণঃ প্রভুঃ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদং স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥

—৫০।৫৩—৫৫

—শ্রীরাধা পরদেবতা। * * । শ্রীরাধা সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ। ইঁহাদের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই (ইঁহারা একাত্মা)।

উক্ত পুরাণে আরও দেখা যায়, শ্রীরাধা নারদকে বলিতেছেন—

অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে ॥
অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্য-কামকলাত্মকঃ।
সত্যং যোষিৎস্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী ॥
অহঞ্চ ললিতাদেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥

—৪৪।৪৪—৪৬

—যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতা দেবী। নিত্যকামকলাত্মক বাসুদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ; আমিই সনাতনী নারী এবং আমিই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ, শ্রীকৃষ্ণে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডে দেখা যায়, পার্ব্বতীর নিকটে শ্রীশিব শ্রীরাধিকাকে "কৃষ্ণাত্মা"—শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপিণী—বলিয়াছেন।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ যে একাত্মা, একই স্বরূপ, উল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন হইতেও তাহা জানা যায়।

———

অনাদিকাল হইতে রাধাকৃষ্ণের দুইরূপে অবস্থিতি



একাত্মা হইয়াও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যে অনাদিকাল হইতেই দুইরূপে বিরাজিত, নারদপঞ্চরাত্র হইতে তাহা জানা যায়।

দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥

—না, প, রা ২।৩।২১

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥

—না, প, রা ২।৩।২৪-২৫

—সেই তরুণ গোপবেশ নবমেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে (অনাদি কালে) দ্বিধা বিভক্ত হইলেন—তাঁহার একভাগ স্ত্রীরূপ হইল; ইঁহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি) বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষ-রূপে রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, শ্যামকান্তি, সগুণ (অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট) এবং নির্গুণ (প্রাকৃত গুণ হীন); তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চলা ললনাকে দেখিয়া তাঁহার সহিত লীলা করিতে উদ্যত হইলেন।

আরও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, শ্রীরাধাও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপা এবং প্রকৃতির অতীত।

যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা ॥
—না, প, রা, ২।৩।৫১

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ যে অনাদিকাল হইতে দুইরূপে বিরাজিত, সেই সম্বন্ধে বেশী শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনেরও প্রয়োজন নাই ; যেহেতু, তাঁহাদের লীলাকথা অতি প্রসিদ্ধ. বহু শাস্ত্রে বর্ণিত। ঋগ্‌বেদ-পরিশিষ্টেও তাঁহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু্"-ইত্যাদি।

গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের কথা

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য নন্দ-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
—শ্রীভা, ১০।৮।১৩

—হে ব্রজরাজ ! তোমার এই পুত্রটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন তনু (বিগ্রহ) প্রকটিত করেন। ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটী বর্ণ হইয়া গিয়াছেন (অর্থাৎ এই তিন বর্ণে তিন বিগ্রহে ইনি ইতঃপূর্ব্বেই অবতীর্ণ হইয়া গিয়াছেন)। ইদানীং (এই দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন (এজন্য ইঁহার কৃষ্ণ একটী নাম)।

এই শ্লোকে বলা হইল—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগেই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রকটিত করিয়া থাকেন।

এই দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার তিনটী বর্ণ—শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই দ্বাপরের পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে (আসন্—অতীত-কালসূচক ক্রিয়াপদ)।

এই শ্লোকে গর্গাচার্য্য ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিলেন। এই ইঙ্গিত দিয়াছেন দুইটী বাক্যে—"গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ" এবং "কৃষ্ণতাং গতঃ"—এই দুইটী বাক্যে। স্বয়ংভগবান্ মূল অবতারী বলিয়া তিনিই বিভিন্ন অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হয়েন; সুতরাং "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ (যিনি যুগানুরূপ দেহ প্রকটিত করেন)"-বাক্যে স্বয়ংভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর, "কৃষ্ণতাং গতঃ—(কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন)"-এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই। শ্লোকস্থ শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিনটী শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত অবতারকেই বুঝাইতেছে (তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাম্—বৈষ্ণবতোষণী টীকা)। বিভিন্ন যুগে শুক্ল-রক্তাদি যে-সমস্ত যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার, পুরুষাবতারাদি যত যত অবতার প্রকটিত হইয়াছেন, শুক্ল-রক্তাদি শব্দের উপলক্ষণে সে-সমস্ত অবতারই সূচিত হইয়াছে।

কৃষ্-ধাতু হইতে কৃষ্ণ-শব্দ নিষ্পন্ন। কৃষ্-ধাতুর অর্থ—আকর্ষণ; আকর্ষণ করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণ; কৃষ্ণতা-শব্দের অর্থ আকর্ষকতা। এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন না বলিয়া গর্গাচার্য্য কেন বলিলেন—ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে—এইবার ইনি স্বীয় সর্ব্বাকর্ষকতা প্রকটন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য "পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১০॥"; কিন্তু নামকরণের সময়ে তাঁহার এইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতা প্রকটিত হয় নাই। অথচ গর্গাচার্য্য বলিলেন—কৃষ্ণতাং

গতঃ—কৃষ্ণতা, আকর্ষকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গর্গাচার্য্য অন্যরূপ আকর্ষকতার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কি সেই আকর্ষকতা? তিনি কাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন? একথার উত্তর পাইতে হইলে উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী একটী শ্লোকের আলোচনা করিতে হয়।

"আসন বর্ণাঃ"-শ্লোকে গর্গাচার্য্য ভঙ্গীতে বলিলেন—ব্রজরাজের এই সন্তানের একটী নাম—কৃষ্ণ। তার পরের শ্লোকে বলিয়াছেন, বাসুদেবও ইঁহার একটী নাম। সেই দিনই প্রথম নামকরণ হইতেছিল। নামকরণ-প্রসঙ্গে গর্গাচার্য্য মাত্র দুইটী নামই প্রকাশ করিলেন—কৃষ্ণ ও বাসুদেব। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই গর্গাচার্য্য বলিলেন—

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥
—শ্রীভা, ১০।৮।১৫

—নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্রটীর গুণকর্ম্মানুরূপ বহু বহু নাম ও রূপ আছে; তৎসমস্ত আমিও জানি না, অন্য লোকেও জানে না।

গর্গাচার্য্য নন্দনন্দনের দুইটী মাত্র নাম প্রকাশ করিয়াছেন—কৃষ্ণ ও বাসুদেব। ইহার পূর্ব্বে অপর কেহও তাঁহার অন্য কোনও নাম রাখেন নাই। অথচ গর্গাচার্য্য বলিলেন, এই নন্দ-তনয়ের গুণ-কর্ম্মানুসারে বহু নাম ও বহু রূপ আছে (সন্তি—বর্ত্তমানকালসূচক ক্রিয়াপদ)। ইহার তাৎপর্য্য কি? এবং এ-সমস্ত বহু নাম এবং বহু রূপই বা কি?

কোনও জীবও যখন মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তাহার পূর্ব্বে হয়তো সে দেবতা-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-লতাদি বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। সেই-সেই যোনিতে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপও ছিল। সে-সমস্ত নাম এবং রূপও

ছিল তাঁহার গুণ-কর্ম্মানুরূপ। কিন্তু শেষবার যখন সে মানুষরূপে জন্ম-গ্রহণ করিল, তখন তাহার নামকরণ-সময়ে সে-সমস্ত নাম-রূপের কথা স্মরণ করিয়া বলা হয় না যে, তাহার "বহু নাম ও রূপ আছে"; বরং বলা যাইতে পারে, তাহার বহু নাম ও রূপ "ছিল।" এই শ্লোকে "বহুনি সন্তি নামানি ইত্যাদি—বহু নাম ও রূপ আছে" এই বাক্যে সূচিত হইতেছে যে, যাঁহার নাম-করণ করা হইতেছে, সেই নন্দ-নন্দন জীবতত্ত্ব নহেন। তবে তিনি কে? তিনি ভগবান্। "গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ"-বাক্যেও তাহা বলা হইয়াছে। "সন্তি"—এই বর্ত্তমান-কালবাচক ক্রিয়াপদে নাম-রূপাদির নিত্যত্বই সূচিত হইতেছে। কেবলমাত্র ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহেরই নাম ও রূপ হয় নিত্য; অপর কাহারও নাম ও রূপ নিত্য হয় না। এই শ্লোকে যে বহু নিত্য নাম ও বহু নিত্য রূপের কথা বলা হইয়াছে, তৎসমস্ত হইতেছে নিত্য ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহেরই নাম ও রূপ। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের নাম এবং রূপকেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নাম এবং নিত্য রূপ বলা হইয়াছে। ইহাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণই অনাদিকাল হইতে এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। ইহা দ্বারাও সূচিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। পরব্রহ্মই অনাদিকাল হইতে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি॥ গোপাল-তাপনী শ্রুতি॥" পূর্ব্বোদ্ধৃত "আসন্ বর্ণাঃ"-শ্লোকের অন্তর্গত "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ"-ইত্যাদির উপলক্ষণে এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। নন্দ-নন্দন এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই আত্মপ্রকট করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার "কৃষ্ণতা—আকর্ষকতা।" সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ

করিয়াই তিনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের তাৎপর্য্য। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল যিনি, তিনি ব্যতীত অপর কেহ সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিতে পারেন না। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল হইতেছেন স্বয়ংভগবান্।

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ংভগবান্ শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।২।৭৪

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে তাহাই সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও তখন তাঁহারই বিগ্রহের মধ্যে অবস্থিতি করেন।

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥

—শ্রীচৈ, চ ১।৪।৯-১১

বৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন—"একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতার-সমষ্টিরূপঃ।—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। বৃ, ভা, ২।৪।১৮৬॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্।

এক্ষণে শ্লোকস্থ "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ" অংশের আলোচনা করা যাউক।

শ্লোকে বলা হইয়াছে, নন্দনন্দন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করেন। যুগ হইল চারিটী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। আর যুগ বাকী রহিল তিনটী—সত্য, ত্রেতা ও কলি। বর্ণও ধারণ করিয়াছেন তিনটী—শুক্ল, রক্ত ও পীত। এক্ষণে, শুক্ল হইতেছেন সত্যযুগের যুগাবতার এবং রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার; সুতরাং যুগাবতাররূপে তিনি সত্যযুগেই শুক্লবর্ণ এবং ত্রেতাযুগেই রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছেন—ইহা সহজেই বুঝা যায়। বাকী রহিল পীতবর্ণ এবং কলিযুগ। সুতরাং কলিযুগেই যে তিনি পীতবর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু যেই চতুর্যুগের দ্বাপরে নন্দ-নন্দনের নামকরণ হইতেছিল, সেই চতুর্যুগের কলিযুগ তখনও অনাগত; অথচ বলা হইয়াছে—শুক্ল ও রক্তের ন্যায় পীতও অতীত হইয়া গিয়াছে (আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ)। ইহাতে বুঝা যায়, নন্দনন্দন যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও চতুর্যুগের কলিতেই পীতবর্ণ হইয়াছিলেন, গর্গাচার্য্য তাহাই বলিয়াছেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, পূর্ব্ব কোনও কলিতে তিনি কি যুগাবতাররূপেই পীতবর্ণ হইয়াছিলেন, না কি অন্য কোনও স্বরূপে। ইহা নির্ণয় করিতে হইবে শ্লোকস্থ "তথা"-শব্দের সহায়তায়—"তথা পীতঃ।"

অনেক সময় পাদপূরণার্থ চ, বৈ, তু, হি ইত্যাদি শব্দ শ্লোকে ব্যবহৃত হয়; পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হইলে ইহাদের কোনও অর্থ থাকে না। কিন্তু পাদপূরণার্থ "তথা"-শব্দ ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং এই শ্লোকের "তথা"-শব্দটী নিরর্থক নয়; শ্লোকের অর্থ-নির্ণয়ে এই "তথা"-শব্দটী উপেক্ষণীয় নহে, "তথা"-শব্দের ব্যঞ্জনা গ্রহণ না করিলে শ্লোকের অভিপ্রেত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। আবার, "তথা" ও "যথা" শব্দদ্বয় এক সঙ্গেই থাকে; যেখানে "তথা" থাকে, সেখানে "যথা"ও

আছে, অথবা যেখানে "যথা" থাকে, সেখানে "তথাও" আছে বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও স্থলে ছন্দ-মিলনের জন্য "যথা" ও "তথা" এই দুইটী শব্দের একটী উহ্যও থাকে। এই শ্লোকেও ছন্দের অনুরোধে "যথা"-শব্দ লিখিত হয় নাই; কিন্তু "যথা" উহ্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শ্লোকের অর্থ-নির্ণয়ের সময়ে উহ্য "যথা"-শব্দটীকে আনিতে হইবে; নচেৎ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইবে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্লোকস্থ কোন্ শব্দের সঙ্গে "যথা"-শব্দের অন্বয় হইবে। "তথা"-শব্দের সহিত যে "পীতঃ"-শব্দের অন্বয়, তাহা শ্লোকে পরিষ্কাররূপেই দেখা যায়—"তথা পীতঃ।"

শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে যে "যথা"-শব্দের স্থান হইতে পারে না, পূর্ব্বে প্রথমার্দ্ধের যে অর্থালোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টরূপেই তাহা বুঝা যায়। শ্লোকের শেষার্দ্ধেই কোনও স্থলে "যথা"-শব্দকে বসাইতে হইবে। শেষার্দ্ধে দুই স্থলে যথা-শব্দকে বসান যায়। "যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ"; অথবা, "যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ (পীততাং গতঃ)।" এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই দুই রূপ অন্বয়ের কোনটি বিচারসহ। প্রথমে "যথা শুক্লো রক্তঃ, তথা পীতঃ" এই অন্বয়েরই বিচার করা যাউক। যথা-তথাদ্বারা যে শব্দদ্বয় অন্বিত হয়, সেই শব্দদ্বয়ের কিছু সমান-ধর্ম্ম থাকে; সমানধর্ম্মত্ব-সূচনার জন্যই যথা-তথা ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত অন্বয় গ্রহণ করিতে হইলে মনে করিতে হইবে—শুক্ল-রক্তের যে ধর্ম্ম বা যে স্বরূপ, পীতেরও সেই ধর্ম্ম বা সেই স্বরূপ। শুক্ল-রক্ত হইতেছেন যথাক্রমে সত্য ও ত্রেতার যুগাবতার; সুতরাং এই অন্বয় গ্রহণ করিতে হইলে বুঝিতে হইবে, পীতও যুগাবতার—কলির যুগাবতার। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, কলির যুগাবতার হইতেছেন—কৃষ্ণ (ইনি নন্দনন্দন স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ নহেন; তাঁহার অংশ মাত্র); তাঁহার নামও কৃষ্ণ,

বর্ণও কৃষ্ণ। "কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥—যুগাবতারের নামও যাহা, বর্ণও তাহা। সত্যের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শুক্ল; ত্রেতার যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ—রক্ত; দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ—শ্যাম এবং কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ—কৃষ্ণ। লঘুভাগবতামৃত, যুগাবতার-প্রকরণ॥ ২৫॥" শ্রীহরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার—কৃষ্ণ। "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ লঘুভাগবতামৃত-টীকাধৃত-বচন॥" আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে—"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।—দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যাম। শ্রীভা, ১১।৫।২৫-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকাধৃত বচন॥" এস্থলে দ্বাপরের যুগাবতার-সম্বন্ধে দুইটী মত পাওয়া গেল; লঘুভাগবতামৃত বলেন—শ্যাম; বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—শুকপত্রাভ, শুকপাখীর পাখার বর্ণের মত। আপাতঃদৃষ্টিতে এস্থলে বিরোধ বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক বিরোধ নাই। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে মেদিনীকোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম-শব্দের একটী অর্থ দেওয়া হইয়াছে—হরিদ্‌বর্ণ; হরিদ্‌বর্ণ অর্থ সবুজবর্ণ (শব্দকল্পদ্রুম); শুকপত্রাভ-শব্দেও সবুজবর্ণই বুঝায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।৫।২৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম্—দ্বাপরে সাধারণ-যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ।" সুতরাং শ্যাম ও শুকপত্রাভ শব্দদ্বয় একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে—হরিদ্‌বর্ণ। আমরা বলিয়া থাকি—শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা; শস্যের বর্ণ—হরিদ্‌বর্ণ, ইহাকেই শ্যামল বলা হয়। আবার উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহে কলির যুগাবতার-সম্বন্ধেও দুই মত পাওয়া গিয়াছে; হরিবংশের মতে—কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে—শ্যাম। এস্থলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই; যেহেতু, শ্যাম-শব্দের অতি সুপ্রসিদ্ধ

অর্থই হইতেছে—কৃষ্ণ; তাই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর, রাধাকৃষ্ণকে রাধাশ্যাম বলা হয়। যাহা হউক, শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা গেল, কলির সাধারণ-যুগাবতারের নাম কৃষ্ণ এবং তাঁহার বর্ণও কৃষ্ণ; কিন্তু কলির যুগাবতার যে পীত, তাহা কোনও শাস্ত্রপ্রমাণেই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ"-এই অন্বয় গ্রহণ করিতে হইলে মনে করিতে হইবে, শুক্ল এবং রক্ত যেমন সত্য ও ত্রেতার সাধারণ-যুগাবতার, পীতও তেমনি কলির সাধারণ-যুগাবতার; কিন্তু ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে; তাই "যথা শুক্লোরক্তঃ, তথা পীতঃ" এইরূপ অন্বয়ও গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাহা হইলে অপর অন্বয়টীই গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই অন্বয়ে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; নচেৎ তথা-শব্দই উপেক্ষিত হইয়া পড়িবে।

অপর অন্বয়টী হইতেছে—"যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ (পীততাং গতঃ)।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যে নন্দ-নন্দনের স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইতেছে; সুতরাং "পীতঃ"-শব্দেও স্বয়ংভগবত্তাই বুঝাইবে; নচেৎ, যথা-তথাদ্বারা ব্যঞ্জিত সমানধর্ম্মত্বই থাকে না। তাহা হইলে ইহাই জানা গেল—পূর্ব্বে কোনও এক কলিতে স্বয়ংভগবান্ নন্দ-নন্দনই স্বয়ংভগবান্-রূপে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পীত-শব্দে স্বর্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণই বুঝায়; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী **কোনও এক কলিতে যে গৌরবর্ণে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, "আসন্‌বর্ণাঃ"-শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল।**

উল্লিখিত আলোচনায় কোনও কোনও স্থলে "সাধারণ-যুগাবতার"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই। যে যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার আর পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না; তিনি স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন। আর যে যুগে স্বয়ংভগবান্

অবতীর্ণ হয়েন না, সেই যুগে যুগাবতার স্বীয় রূপে ও নামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; তাঁহাকেই "সাধারণ-যুগাবতার" বলা হয়। এইরূপে শুক্ল হইলেন সত্যযুগের সাধারণ-যুগাবতার, রক্ত হইলেন ত্রেতার সাধারণ-যুগাবতার, শুকপত্রাভ (শ্যাম) হইলেন দ্বাপরের সাধারণ-যুগাবতার এবং কৃষ্ণ (স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ নহেন, তাঁহার অংশ) হইলেন কলির সাধারণ-যুগাবতার। যে কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই কলিতে আর কলির সাধারণ-যুগাবতার কৃষ্ণ পৃথক্‌ভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই। স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মার এক দিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তেঁহো একবার।
অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।৩-৪

বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে একহাজারটী চতুর্যুগ—অর্থাৎ এক হাজার সত্যযুগ, একহাজার ত্রেতাযুগ, একহাজার দ্বাপরযুগ এবং একহাজার কলিযুগ—থাকে।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে॥

—বি, পু, ১।৩।১৪

যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গেল, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল কলিতে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন না, কোনও কোনও কলিতেই তদ্রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কোন্ কলিতে তিনি

পীতবর্ণে বা গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। এক্ষণে সেই শ্লোকটীর আলোচনা করা যাইতেছে।

কোন্ কলিতে স্বয়ংভগবানের গৌরবর্ণে অবতার

গত দ্বাপরযুগে কবি, হবি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন—এই নয়জন যোগীন্দ্র নিমি-মহারাজের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিমি-মহারাজের প্রশ্নে তাঁহারা অনেক তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন্ যুগে ভগবান্ কি রূপে অবতীর্ণ হয়েন, কোন্ যুগের উপাস্য কে, তাঁহার উপাসনার বিধানই বা কি, নিমি-মহারাজ এই প্রশ্নের উত্থাপন করিলে নবযোগীন্দ্রের একতম করভাজন-ঋষি সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের উপাস্য-স্বরূপের বিবরণ এবং উপাসনার বিধি বলিয়া তাহার পরে কলির উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়াছিলেন।

ঋষি করভাজনের উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহা এই। শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—বেদ, ইতিহাস (মহাভারত) এবং পুরাণ হইতেছে অপৌরুষেয়, পরব্রহ্মের নিশ্বাস। "এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥" মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়, এই অপৌরুষেয় পুরাণ ছিল মাত্র একখানি; তাহা ছিল শতকোটি শ্লোকে পরিপূর্ণ। "পুরাণমেকমেবাসীৎ

তদা কল্পান্তরেঽনঘ। ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ মৎস্য পু। ৫৩।৪ ॥” প্রতি দ্বাপরে ভগবান্‌ই ব্যাসরূপে চারিলক্ষ শ্লোক-সমন্বিত অষ্টাদশ পুরাণ ভূর্লোকে প্রকাশিত করেন। দেবলোকেতে অদ্যাপিও শতকোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণ বর্ত্তমান।

কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো নৃপ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥
চতুর্ল্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ॥
তথাঽষ্টদশধা কৃত্বা ভূর্লোকেঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে।
অদ্যাপি দেবলোকেঽস্মিন্ শতকোটি-প্রবিস্তরম্ ॥
—মৎস্য পু ॥ ৫৩।৮-১০

প্রতি দ্বাপরে চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মক যে অষ্টাদশ পুরাণ প্রকটিত হয়, তাহা হইতেছে—যে চতুর্যুগের অন্তর্গত সেই দ্বাপর, সেই চতুর্যুগের উপযোগী। বর্ত্তমানে যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত হইতেছে বর্ত্তমান্ চতুর্যুগের উপযোগী। ঋষি করভাজন যে চারিযুগের উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি সম্বন্ধেই। তিনি যে কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনার কথা বলিয়াছেন, তাহাও হইতেছে বর্ত্তমান্ চতুর্যুগের অন্তর্গত কলি (অর্থাৎ বর্ত্তমান কলি) সম্বন্ধেই। দ্বাপরযুগেই তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

করভাজন-ঋষি কলির উপাস্য এবং উপাসনার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
—শ্রীভা, ১১।৫।৩২

এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলির উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনার বিধির কথা বলা হইয়াছে—সুমেধা ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা বা উপাসনা করেন। আর, কলির উপাস্যরূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ত্বিষাকৃষ্ণ। এই শব্দগুলির অর্থ কি, তাহা দেখা যাউক।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ—অঙ্গ এবং উপাঙ্গরূপ অস্ত্র এবং পার্ষদের সহিত বর্ত্তমান। কলির উপাস্যের অঙ্গ এবং উপাঙ্গ তাঁহার পার্ষদ এবং অস্ত্রের কাজ করিয়া থাকে। যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদ সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য করিয়া থাকেন। যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কলির উপাস্য অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য করিবেন ; এজন্য তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গকে তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদ বলা হইয়াছে।

কলির উপাস্যের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—"কৃষ্ণবর্ণ" এবং "ত্বিষাকৃষ্ণ" শব্দগুলিদ্বারা। এই শব্দগুলির তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই শ্লোকে যে বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলিযুগের উপাস্যের কথাই বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধীয় আলোচনায় শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদের একটী উক্তির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ শ্রীভা, ৭।৯।৩৮॥—কলিতে ভগবানের ছন্ন অবতার।" ছদ্-ধাতু হইতে ছন্ন-শব্দ নিষ্পন্ন ; ছদ্-ধাতু আচ্ছাদনে। তাহা হইলে ছন্ন-শব্দের অর্থ হইল—আচ্ছাদিত। বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বিগ্রহটী থাকিবে আচ্ছাদিত ; সুতরাং তাঁহার বিগ্রহের নিজস্ব বা স্বাভাবিক রূপটী বা বর্ণটী সাধারণতঃ

দেখা যাইবে না ; কাজেই সেই স্বাভাবিক রূপের কান্তিটীও বাহিরে দেখা যাইবে না। যাহাদ্বারা তিনি আচ্ছাদিত থাকিবেন, তাহার রূপ বা কান্তিটীই বাহিরে দেখা যাইবে। এই ছন্নত্বই বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলির অবতারের একটী বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ যাঁহাতে নাই, এই কলির অবতাররূপে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইবে না ; যেহেতু, বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ-লক্ষণের দ্বারা ; সামান্য-লক্ষণে বস্তুর পরিচয় হয় না। লেজ-রোমবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু বলিলেই গরুর পরিচয় হয় না ; যেহেতু, লেজ-রোমবিশিষ্ট বহু জাতীয় চতুষ্পদ জন্তু আছে। সাস্নাই (গলদেশে কম্বলের ন্যায় দোলায়মান বস্তুবিশেষই) হইতেছে গরুর বিশেষ লক্ষণ ; এই বিশেষ-লক্ষণ ব্যতীত গরু চিনা যায় না।

শ্লোকস্থ "কৃষ্ণবর্ণ" এবং "ত্বিষাকৃষ্ণ" শব্দগুলির একাধিক অর্থ হইতে পারে ; কিন্তু যে বা যে সকল অর্থে উক্ত বিশেষ লক্ষণ ছন্নত্ব ব্যঞ্জিত হইবে, বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় কলির উপাস্যের স্বরূপ-নির্ণয়ে কেবলমাত্র সেই বা সেই সকল অর্থই গ্রহণীয় হইবে। এই কথা স্মরণ রাখিয়া অর্থালোচনা করিতে হইবে। এক্ষণে "কৃষ্ণবর্ণ" এবং "ত্বিষাকৃষ্ণ" শব্দগুলির অর্থালোচনা করা হইতেছে।

কৃষ্ণবর্ণ :—এই শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃষ্ণ হইতেছে বর্ণ যাঁহার, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণং বর্ণয়তি যঃ. সঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ; কৃষ্ণকে—কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদিকে—বর্ণন করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। এই দুই অর্থের কোন্‌টী গ্রহণীয়, না কি দুইটীই গ্রহণীয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের অর্থের সহিত মিলাইয়া।

ত্বিষাকৃষ্ণ :—ইহা দুইটী শব্দও হইতে পারে, একটী শব্দও হইতে পারে। "ত্বিষা" এবং "কৃষ্ণ" এই দুইটী শব্দ পৃথক্‌ভাবে শ্লোকে

লিখিত হইয়াছে মনে করিলে "ত্বিষা কৃষ্ণ" হইবে দুইটী শব্দ ; ত্বিট্-শব্দের অর্থ তেজঃ বা কান্তি ; তাহার তৃতীয়া বিভক্তিতে হয় "ত্বিষা"—অর্থ, কান্তিদ্বারা, কান্তিতে। "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-বাক্যাংশের অর্থ হইবে—কান্তিতে কৃষ্ণ ; যাঁহার কান্তি বা বাহিরের বর্ণটী কৃষ্ণ। আর, ত্বিষা + অকৃষ্ণঃ = (সন্ধিতে) ত্বিষাকৃষ্ণঃ ; "ত্বিষা" এবং "অকৃষ্ণঃ" এই দুইটী শব্দকে সন্ধিতে যুক্ত করিলে পাওয়া যাইবে একটী শব্দ—ত্বিষাকৃষ্ণ ; অর্থ হইবে —কান্তিতে অকৃষ্ণ ; প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষ-লক্ষণের সহিত এবং "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নির্ণয় করিতে হইবে—"ত্বিষাকৃষ্ণঃ"-শব্দের এই পরস্পর বিরোধী অর্থদ্বয়ের মধ্যে কোন্টী গ্রহণীয়।

প্রথমে, "ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-দুইটী শব্দ মনে করিয়া তাহার অর্থ—"কান্তিতে কৃষ্ণ"-এই অর্থের সহিত "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অর্থদ্বয়ের বা তাহার কোনও একটীর সঙ্গতি হইতে পারে কিনা বিবেচনা করা যাউক। "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের এক অর্থ—যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ ; যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদি "ত্বিষা কৃষ্ণঃ—কান্তিতে কৃষ্ণ" হয়েন, তাহা হইলে "ছন্নত্ব" পাওয়া যায় না। কারণ, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, আচ্ছাদিত না হইলে তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণই হইবে। "ছন্নত্ব" পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের "কৃষ্ণকে বর্ণন করেন যিনি"—এই অর্থের সঙ্গে "ত্বিষা কৃষ্ণ"-শব্দদ্বয়ের অর্থের সঙ্গতি হয় কিনা। যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণসম্বন্ধে কিছু জানা যায় না ; তাঁহার বর্ণ যদি কৃষ্ণ না হয়, তাহা হইলে "কান্তি কৃষ্ণ" হইলে ছন্নত্ব বুঝাইতেও পারে। কিন্তু তিনি কে হইতে পারেন ? হয়তো স্বয়ংভগবান্, না হয় লীলাবতার, আর না হয় যুগাবতার—এই তিনের কেহই হইবেন ;

যেহেতু, এই তিনরূপেই ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই তিনরূপের মধ্যে লীলাবতার বাদ দিতে হইবে; যেহেতু, কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই। "কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৬।৯৭ ॥" লীলাবতার বাদ গেলে আর বাকী থাকে স্বয়ংভগবান্, অথবা যুগাবতার। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ; আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কলির সাধারণ-যুগাবতারের বর্ণও কৃষ্ণ। ইঁহাদের কেহ যদি কলিতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, আর যদি তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণ—"ত্বিষা কৃষ্ণঃ"—হয়, তাহা হইলে "ছন্নত্ব" পাওয়া যায় না; যেহেতু, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, অন্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইলে তাঁহার কান্তি "কৃষ্ণ" হইতে পারে না।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল—"ত্বিষা কৃষ্ণঃ"-স্থলে দুইটী শব্দ আছে মনে করিলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্বের" সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কোনও অর্থ পাওয়া যায় না; সুতরাং "ত্বিষা কৃষ্ণ"-দুইটী শব্দ, এইরূপ অনুমান বিচারসহ নহে।

এক্ষণে, "ত্বিষাকৃষ্ণকে" একটীমাত্র শব্দ ধরিয়া তাহার অর্থ—কান্তিতে অকৃষ্ণ—ধরিয়া কোনও বিচারসহ অর্থ পাওয়া যায় কিনা দেখা যাউক।

"কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের "যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ"-এই অর্থের সহিত "ত্বিষাকৃষ্ণ"-শব্দের "কান্তিতে অকৃষ্ণ"-অর্থের সঙ্গতি থাকে কিনা দেখা যাউক। যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ, তিনি যে "অকৃষ্ণ" কোনও বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং এস্থলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্ব" পাওয়া যায়। এই অর্থ গ্রহণীয়।

তারপর "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের অপর অর্থ—"যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন" —এই অর্থ ধরিয়া বিচার করা যাউক। যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণ কি, জানা যায় না ; কিন্তু তাঁহার কান্তি "অকৃষ্ণ"। তিনি কে হইতে পারেন ? পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা অনুসারে, কলিতে যখন লীলাবতার নাই, তখন তিনি হয়তো স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর না হয় কলির সাধারণ-যুগাবতারই হইবেন। উভয়ের বর্ণ ই কৃষ্ণ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অথবা সাধারণ-যুগাবতার কৃষ্ণ কলির উপাস্য রূপে যদি "অকৃষ্ণ কান্তিতে" অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে বিশেষ লক্ষণ "ছন্নত্ব" পাওয়া যায় ; সুতরাং এইরূপ অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে।

এক্ষণে নির্ণয় করিতে হইবে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই "অকৃষ্ণবর্ণে" আচ্ছাদিত হইয়া কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, না কি যুগাবতার কৃষ্ণ "অকৃষ্ণবর্ণে" অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া করভাজন-ঋষি বলিলেন ? যুগাবতার যে অন্য কোনও বর্ণে আচ্ছাদিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এরূপ কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কলিতে "অকৃষ্ণ-বর্ণে" আচ্ছাদিত হইয়া যুগাবতার কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন—একথা ঋষি করভাজনের অভিপ্রেত হইতে পারে না। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও বিশেষ কলিতে "পীত" বর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, পূর্ব্বোদ্ধৃত "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"-শ্লোক হইতে জানা যায়। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে বর্ত্তমান্ চতুর্যুগীয় কলিতে "অকৃষ্ণবর্ণে" অবতীর্ণ হইবেন— ইহাই করভাজন বলিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই "অকৃষ্ণ বর্ণ" কি ? "আসন্ বর্ণাঃ"-শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোনও বিশেষ কলিতে "পীত"-বর্ণে অবতীর্ণ হয়েন ; স্বয়ং-ভগবান্-রূপে তিনি যে কৃষ্ণবর্ণ, বা পীত বর্ণ ব্যতীত অপর কোনও

বর্ণে অবতীর্ণ হয়েন, এরূপ কোনও শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং "অকৃষ্ণ বর্ণ" বলিতে "পীত"বর্ণকেই বুঝায়। এজন্যই কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"অকৃষ্ণবরণে কহে পীত বরণ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৩ ৪৫॥" পীতবর্ণ—স্বর্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ।

এইরূপে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা গেল—বর্ত্তমান্ কলির উপাস্যরূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া গত দ্বাপরেই করভাজন-ঋষি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু তাঁহার স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত থাকিবে পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ দ্বারা এবং তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গ তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদের কাজ করিবে।

গত দ্বাপর-যুগে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন; করভাজন বলিলেন—তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ত্তমান কলিতে তিনিই আবার পীতবর্ণে বা গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হইবেন। আবার ইহাও জানা গিয়াছে—কোনও বিশেষ কলিতে স্বয়ংভগবান্ গৌর বা পীত বর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সকল কলিতে নহে; সকল কলিতেই যদি তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে শাস্ত্রে কলির সাধারণ-যুগাবতারের কথা বলা হইতনা। তাহা হইলে জানা গেল—যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগই হইতেছে বিশেষ কলিযুগ এবং সেই বিশেষ কলিযুগেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

———

স্বয়ংভগবানের গৌরত্বের হেতু



"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের আলোচনায় জানা গিয়াছে, বিশেষ কলিতে (যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গৌরবর্ণে স্বীয় শ্যামবর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। এই গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণও ব্র:জেন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ স্বরূপে ভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহারা একই তত্ত্ব ; যেহেতু, একই স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। তাঁহাদের পার্থক্য কেবল ভাব-বর্ণাদিতে ; সুতরাং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহাদের ভাব-বর্ণাদির বৈশিষ্ট্য। আবার, "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ"-এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায়, সকল ভগবৎ-স্বরূপই নিত্য ; সুতরাং তাঁহাদের স্ব-স্ব-ভাব-বর্ণাদিও নিত্য। তাহা হইলে গৌরবর্ণ স্বয়ং-ভগবানের গৌরবর্ণ টীও নিত্যই ; ইহা কেবল প্রকট সময়ের জন্য আগন্তুক নহে ; আগন্তুক হইলে ইহার নিত্যত্ব থাকে না।

কিন্তু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্বরূপগত বর্ণ হইতেছে—নবজলধর শ্যাম। "মেঘাভং বিদ্যুতাম্বরম্"-ইত্যাদি গোপাল-তাপনী-শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলেন। তাহা হইলে এই গৌরবর্ণ টী কোথা হইতে আসিল ?

এই পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ টী যখন নিত্য এবং এই বর্ণ টী যখন গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের স্বরূপেই নিত্য অবস্থিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাহা স্বয়ংভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট, এমন

কোনও বস্তুই এই পীতবর্ণটীর হেতু হইবে। একমাত্র তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই অন্তরঙ্গ-ভাবে তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট, স্বরূপ-শক্তি-ব্যতীত অপর কিছুই তাঁহার স্বরূপে—বিগ্রহ-মধ্যে বা বিগ্রহে—থাকে না। সুতরাং এই পীতবর্ণটীর হেতুও স্বরূপ-শক্তিই হইবে, অপর কিছু হইতে পারে না।

স্বরূপ-শক্তি দুইরূপে অবস্থিত—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। অমূর্ত্ত শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যেই ; সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেই ইহা থাকে ; অমূর্ত্ত শক্তির কোনও বর্ণ নাই ; সুতরাং অমূর্ত্ত-শক্তিদ্বারা কোনও ভগবৎ-স্বরূপেরই "ছন্নত্ব" জন্মিতে পারে না।

শক্তির মূর্ত্তরূপ হইল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মূর্ত্তরূপে স্বরূপ-শক্তি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপে তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গিনী রূপেই অবস্থান করেন। যেমন, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধা ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা হইতেছেন—সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী হ্লাদিনীর পরম-সারভূত মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপিণী। শ্রীরাধাই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূল মূর্ত্তরূপ, স্বরূপ-শক্তির মূল অধিষ্ঠাত্রী ; লক্ষ্মীদেবী-আদি হইতেছেন তাঁহার অংশরূপা। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ॥ সিদ্ধান্তরত্ন ২।২২ অনুচ্ছেদধৃত অথর্ব্ব-বেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী শ্রুতিবাক্য।" মূর্ত্ত-শক্তির রূপ আছে, বর্ণ আছে। সুতরাং মূর্ত্ত-শক্তিই বর্ণ দিতে পারেন। যে মূর্ত্ত-শক্তি কোনও ভগবৎ-স্বরূপের কান্তারূপে সেই ভগবৎ-স্বরূপের নিত্য-সঙ্গিনী, সেই মূর্ত্ত-শক্তি কেবলমাত্র সেই ভগবৎ-স্বরূপকেই স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে তাহা দিতে পারেন না ; যেহেতু, অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার নিত্য-সঙ্গিত্ব নাই। এইরূপে,

স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিত্যসঙ্গিনী শ্রীরাধাই ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন, লক্ষ্মী-আদি তাহা পারেন না।

কিন্তু একজন অপর একজনকে কিরূপে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন? বর্ণ তো দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবেই সংলগ্ন থাকে? সুতরাং শ্রীরাধা কিরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বীয় বর্ণ দিতে পারেন? ইহার উত্তর এই। শ্রীরাধা হইতেছেন গৌরাঙ্গী; মূর্ত্ত-শক্তি বলিয়াই শ্রীরাধার এই গৌরবর্ণ; অমূর্ত্ত হইয়া গেলে তাঁহার কোনও বর্ণ থাকিবে না। সুতরাং শ্রীরাধার স্বীয় মূর্ত্তত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বহিরাবরণরূপে তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বীয় বর্ণে আচ্ছাদিত করিতে পারেন। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—একজন আর একজনের সহিত এইভাবে কি একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন? যদি দুই জন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন, তাহা হইলে উক্তরূপভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না; কিন্তু পূর্ব্বেই শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা দেখান হইয়াছে—শ্রীরাধা ও ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণ ভিন্ন নহেন; তাঁহারা একাত্মা, একই স্বরূপ; একই স্বরূপ বলিয়া উক্তরূপভাবে তাঁহাদের একত্ব-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধা উক্তরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্ব-প্রাপ্ত হইবেন কেন? উত্তর এই। শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; শক্তির একমাত্র কার্য্যই হইতেছে শক্তিমানের সেবা, তাহাতেই শক্তির শক্তিত্ব। শ্রীরাধারও একমাত্র কর্ত্তব্য—তাঁহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট পূরণ। এজন্যই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা "কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৪৫॥"

শ্রীকৃষ্ণের কোন্ অভীষ্ট-পূরণের জন্য শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলেন?

ইহার উত্তর এই। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন রস-স্বরূপ। "রসো বৈ সঃ।-শ্রুতি।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রস-শব্দের দুইটী অর্থ—পরম আস্বাদ্য রস এবং পরম-আস্বাদক রস, রসিক-শিরোমণি। রসঘন-বিগ্রহ, আনন্দঘন-বিগ্রহ, মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরম-তম আস্বাদ্য। তিনি স্বীয় মাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক। "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১০॥" তাঁহার মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২১।৮৮॥" শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ মহাকালরূপে কারণার্ণবে অবস্থিত থাকিয়া দ্বারকাবাসী জনৈক বিপ্রের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন—ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজপুত্রদিগকে নেওয়ার জন্য মহাকালপুরে আসিবেন, তখন তাঁহার দর্শন পাইয়া তিনি স্বীয় অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবেন, এই আশায়। বস্তুতঃ, অর্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বিজপুত্রদের অনুসন্ধানে মহাকালপুরে আসিয়াছিলেন, তখন মহাকালরূপী নারায়ণ সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন।

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে॥ শ্রীভা, ১০।৮৯।৫৮

শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লুব্ধা হইয়া বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী যে উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

শ্রীভা, ১০।১৬।৩৬

কেবল ইহাই নহে; “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২১।৮৬ ॥” শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য “আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর ॥ শ্রীচৈ, চ. ২ ২৮।১১২ ॥” শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপ—“বিস্মাপনং স্বস্য চ ॥ ৩।২।১২ ॥—শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এত রূপ আমার? নিজের রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়ের একটী বিবরণ শ্রীপাদ রূপগোস্বামী দিয়াছেন। দ্বারকাতে একদিন মণিভিত্তিতে প্রতিফলিত নিজের রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মে মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥

—ললিতমাধব ॥ ৮।৩২ ॥

—অহো! অননুভূতপূর্ব্ব চমৎকারজনক এবং গরীয়ান্ কি অনির্ব্বচনীয় আমার এই মাধুর্য্যরাশি প্রকাশ পাইতেছে—যাহা দর্শন করিয়া এই আমিও (যাঁহার প্রতিবিম্ব, সেই আমিও) লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরাধার ন্যায় ঔৎসুক্য সহকারে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি।

যাহা দেখিলে বিস্ময় জন্মে, তাহা আস্বাদন করিবার জন্য বাসনা নিতান্ত স্বাভাবিকী।

এইরূপে দেখা গেল, স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের একটা বলবতী লালসা আছে। ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে তিনি যে তাঁহার এই লালসা পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে বুঝা যায়, ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। তাহার হেতুর কথা বলা হইতেছে।

রস-আস্বাদনই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত স্বভাব। ইহা তাঁহার স্বরূপগত স্বভাব বলিয়া অপ্রকটলীলাতেও তিনি রস আস্বাদন করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডে যখন লীলা প্রকটিত করেন, তখনও তিনি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। আবার উভয়লীলাতে তাঁহার পরিকরবর্গকেও রস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার আস্বাদ্য রস দুই প্রকারের—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস এবং স্বীয় মাধুর্য্যরস। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারিত হয় তাঁহার লীলাতে; তাঁহার পরিকর-ভক্তদের সহিত লীলাতে তিনি তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া থাকেন, পরিকর-ভক্তদিগকেও তাহা আস্বাদন করাইয়া থাকেন এবং পরিকর-ভক্তগণ তাঁহার মাধুর্য্যরসও আস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। "পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৭।১৩৭॥" যাঁহার মধ্যে এই প্রেমের যতটুকু বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যও তিনি ততটুকুই আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই কবিরাজগোস্বামী তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব-প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১১৫॥" শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমই হইল প্রেমের সর্ব্বাতিশায়িবিকাশময় প্রেম; ইহাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ; সুতরাং শ্রীরাধাই পূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন এবং এই মাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দও শ্রীরাধারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীরাধাই এই মাদনের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ কেবল ইহার বিষয় মাত্র; শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মাদনের বিকাশ নাই। লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনার্থই এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বীয়মাধুর্য্যরস পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের উপায় ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নাই—প্রকটলীলাতেও না, অপ্রকট-

লীলাতেও না। প্রেমের বিষয়রূপে শ্রীরাধিকাদি পরিকরবর্গের সেবা লাভ করিয়া, তাঁহাদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া, যে আনন্দ পাওয়া যায়, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা পূর্ণতমরূপেই আস্বাদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রেমের আশ্রয়রূপে শ্রীরাধিকাদি তাঁহার সেবা করিয়া, মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া, যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা উপভোগ করিতে পারেন না। তাই তাঁহার স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের বাসনা থাকে অপূর্ণ। তাঁহার মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে অনির্ব্বচনীয় অপরিসীম আনন্দ পাইয়া থাকেন, শ্রীরাধার অঙ্গে তাহার লহরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারেন—প্রেমের বিষয়রূপে তিনি যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তদপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ প্রেমের আশ্রয়রূপে শ্রীরাধা অনুভব করিয়া থাকেন। বিষয়ের আনন্দ অপেক্ষা আশ্রয়ের আনন্দ অনন্তগুণে অধিক। শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটি-গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১১৫ ॥ নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৫৯ ॥" দিনের পর দিন শ্রীরাধার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন-জনিত আনন্দ-তরঙ্গ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের অপূর্ণ বাসনা যেন ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। ব্রজলীলায় অনাদিকাল হইতেই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের এই অবস্থা ; যেহেতু, ব্রজলীলায় তিনি শ্রীরাধার মাদনের আশ্রয় নহেন, হইতেও পারেন না ; কেননা, নিত্য-ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্যই এই যে, এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধাপ্রেমের বিষয় মাত্র, এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন প্রেমের বিষয়-প্রধান বিগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণ জানেন, শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাঁহার স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। তাই, শ্রীরাধা-

প্রেমের আশ্রয় হওয়ার জন্য তাঁহার বলবতী বাসনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শ্রীরাধাও তাহা জানেন। "গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত। প্রেমসেবা-পরিপাটী ইষ্ট-সমীহিত॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪। ১৭৫॥" আদিপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণও একথা বলিয়াছেন। "মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥ লঘুভাগবতামৃতধৃত আদিপুরাণ-বচন॥—অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগত ভাব গোপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, অন্য কেহ তাহা জানে না।" শ্রীরাধার একমাত্র কর্ত্তব্যই হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনার পূরণ। "কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৭৫॥" তিনি ইহাও জানেন—তাঁহার মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ণ বাসনার পূরণ হইতে পারে না। তাই তিনি তাহার মাদন-ভাব শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। কিরূপে দিলেন?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ একাত্মা হইলেও উভয়ে মিলিয়া ঐক্যপ্রাপ্ত না হইলে এক জনের ভাব অপর জনে নিতে পারেন না। শ্রীরাধার মাদন-ভাব শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়ার জন্যই শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ঐক্যপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। শ্রীরাধা স্বীয় মাদনাখ্য প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে এবং স্বীয় নবগোরচনা-গৌর অঙ্গদ্বারা শ্যামসুন্দরের প্রতি শ্যাম-অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহাতেই শ্যামসুন্দর গৌরসুন্দর হইয়াছেন—ত্বিষাকৃষ্ণ—অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর—হইয়াছেন।

কিন্তু শ্রীরাধা স্বীয় মূর্ত্তত্ব—গৌরবর্ণ—রক্ষা করিয়া কিরূপে স্বীয় অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিলেন? শ্রীউজ্জ্বলনী-

মণি হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। "গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের কোনও এক কুঞ্জে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন আছেন; উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব তাঁহাদের উভয়ের দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাঁহাদের এই ভাবমাধুরী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ভ্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূ তভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

—উ, নী, স্থায়িভাব॥ ১১০

—হে গোবর্দ্ধন-গিরি-নিকুঞ্জবিহারি-কুঞ্জরপতে! শ্রীরাধিকার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ-(নামক-সাত্ত্বিকভাবরূপ তাপ) দ্বারা ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদভ্রম অপসারণ পূর্ব্বক (উভয়ের চিত্তকে) একীভূত করিয়া সুনিপুণ-শৃঙ্গারশিল্পী এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বহুপরিমাণ নবরাগরূপ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।"

এই উক্তি হইতে জানা যায়, প্রেম-পরিপাক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্ত-দ্বয়কে গলাইয়া এমনভাবে এক করিয়া দিয়াছিল যে, তাহাদের ভেদভ্রম পর্য্যন্ত দূরীভূত হইয়াছিল। সেই মহাপরাক্রান্ত প্রেমই কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধার অঙ্গকেও যেন গলাইয়া তাঁহার প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আলিঙ্গিত করাইয়া শ্যামকে গৌর করিয়া দিয়াছে। ইহাই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গৌরত্বের হেতু। ইহা হইতে, ইহাও জানা গেল—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে বর্ত্তমান কলির উপাস্য যে ভগবৎ-স্বরূপের কথা করভাজন-ঋষি গত দ্বাপরে বলিয়া গিয়াছেন, তিনি হইতেছেন

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐক্যপ্রাপ্ত স্বরূপ। ইনি যে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাও জানা গেল।

স্বয়ংভগবানের সন্ন্যাসরূপের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী উপপুরাণ হইতে একটী প্রমাণ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তাহা এই।

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।১৫ শ্লো

—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—"হে ব্রহ্মন্ বেদব্যাস! কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং আপামর-সাধারণকে (পাপহতান্ নরান্) হরিভক্তি (কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম) গ্রহণ করাইয়া থাকেন (প্রেমদান করিয়া থাকেন), উল্লিখিত প্রমাণ হইতে তাহা জানা গেল।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের নিকটে উক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। ব্যাসদেব গত দ্বাপরে আবির্ভূত হইয়াছেন ; সুতরাং গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই যে তিনি ব্যাসদেবের নিকটে ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্; তিনি ব্রজপ্রেম দিতে সমর্থ। গত দ্বাপরে যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই আপামর-সাধারণকে প্রেম দিলেন না কেন? বিশেষ কলির অপেক্ষা রাখিলেন কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এই। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিতে পারেন, পশুপক্ষি-বৃক্ষলতাদিকে প্রেম দিয়াছেনও; "যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বাপরের ব্রজলীলায় তিনি অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন না। অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিণী ছিলেন মহাভাবস্বরূপা প্রেমঘন-বিগ্রহা শ্রীরাধা। অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী না হইলে নির্ব্বিচারে যাহাকে-তাহাকে ব্রজপ্রেম—বিশেষতঃ উন্নত উজ্জ্বল রসস্বরূপ কান্তাপ্রেম—দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ কলিতে শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত গৌরস্বরূপে তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তিনি অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী হইতে পারেন, তখনই তিনি নির্ব্বিচারে প্রেমদান করিতে পারেন। এজন্যই বিশেষ কলিতে প্রেমদানের কথা ব্যাসদেবের নিকটে তিনি বলিয়াছেন। (পাপহতলোকদিগকেও প্রেমদানের কথাতেই নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে প্রেমদানের কথা সূচিত হইতেছে)।

যাহা হউক, উপপুরাণের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা গেল—বিশেষ কলিতে আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান করার নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই লীলাতে তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়া থাকেন। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে, বিশেষ কলিতে স্বীয়মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্যই তিনি গৌরবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন। তাহা হইলে জানা গেল—স্বীয়মাধুর্য্য আস্বাদন হইতেছে এই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের লীলার নিজস্ব হেতু এবং অবতীর্ণ হইয়া আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান হইতেছে, জীবের দিক্ হইতে তাঁহার অবতরণের

হেতু। প্রেমদান তাঁহার নিজস্ব হেতু নহে বলিয়া ইহাকে অবতরণের আনুষঙ্গিক বা বহিরঙ্গ হেতুও বলা যায়।

গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, মহাভারত হইতেও তাহা জানা যায়। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে নিম্নলিখিত উক্তি দৃষ্ট হয়।

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ৯২

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫

—"কৃষ্ণ" এই উত্তমবর্ণদ্বয় বর্ণন করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "সুবর্ণ-বর্ণ"; তাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় গৌর এবং উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটী নাম "হেমাঙ্গ"; সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গসমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটী নাম "বরাঙ্গ"; চন্দনের অঙ্গদ পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "চন্দনাঙ্গদী"; সন্ন্যাসগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম "সন্ন্যাসকৃৎ—সন্ন্যাসী"; ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া তাঁহার একটী নাম "শম"; অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তাঁহার একটী নাম "শান্ত"; এবং কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তাঁহার নাম "নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ।"

গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের ভক্ত-ভাবত্বের প্রমাণ

কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন ভক্তভাবের পরিচায়ক; যেহেতু, ভক্তই কৃষ্ণনামাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের একটী অর্থ—কৃষ্ণকে (কৃষ্ণের নাম-রূপ-

গুণাদিকে) বর্ণন করেন যিনি, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। সেই শ্লোক হইতে ইহাও জানা যায়—গৌববর্ণ স্বয়ংভগবান্ই কৃষ্ণকে বর্ণন করেন ; সুতরাং তিনি ভক্তভাবময়।

মহাভারতোক্ত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের "সুবর্ণবর্ণঃ"-শব্দেও হেমাঙ্গ (গৌরবর্ণ) ভগবানের ভক্তভাবত্ব সূচিত হইতেছে। এস্থলে "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দে "সুবর্ণের (স্বর্ণের) ন্যায় বর্ণ" বুঝায় না ; যেহেতু, "হেমাঙ্গ"-শব্দেই তাহা সূচিত হইতেছে। সুবর্ণ—উত্তম বর্ণ ; কৃষ্ণনামের বর্ণদ্বয় অপেক্ষা উত্তম বর্ণ (অক্ষর) আর কিছু হইতে পারে না। তাই "সুবর্ণ"-অর্থ—উত্তম বর্ণ (অক্ষর), কৃষ্ণনামের অক্ষরদ্বয়।" তাহা যিনি বর্ণন করেন, তিনি "সুবর্ণবর্ণ"—ভক্তভাবময়।

মহাভারতোক্ত "সন্ন্যাসকৃৎ, শমঃ, শান্তঃ"-প্রভৃতি শব্দও হেমাঙ্গ (গৌরবর্ণ ভগবানের) ভক্তভাবত্ব সূচিত করিতেছে।

পূর্ণতম-ভক্তভাবময়ী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়াতেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের ভক্তভাব। ভক্তভাবেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব।

শ্রুতিতে গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্

মুণ্ডকোপনিষদে রুক্মবর্ণ পুরুষ সম্বন্ধে একটী বাক্য দৃষ্ট হয়।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩

—যখন কেহ সর্ব্বকর্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মযোনি স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেমভক্তিমান্ হয়েন, তাঁহার পুণ্য ও পাপ (সমস্ত কর্ম্মফল) বিধৌত হইয়া যায়, তিনি নিরঞ্জন (মায়ার লেপশূন্য) হয়েন এবং সেই রুক্মবর্ণ-পুরুষের সঙ্গে পরম-সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।

এই শ্রুতিবাক্যে, পশ্যঃ-শব্দের অর্থ দ্রষ্টা; পশ্যতি ইতি পশ্যঃ—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য। রুক্ম—অর্থ স্বর্ণ; রুক্মবর্ণঃ—স্বর্ণবর্ণ, গৌরবর্ণঃ। ব্রহ্মযোনি—ব্রহ্মেরও যোনি বা মূল; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যিনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্—আমি ব্রহ্মেরও (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও) প্রতিষ্ঠা, নিদান, তিনি—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। নিরঞ্জনঃ—মায়ার অঞ্জন-শূন্য, সম্যক্‌রূপে মায়ামুক্ত। বিদ্বান্—বিদ্যাবান্, ব্রহ্মজ্ঞ। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল ভক্তি; "ভক্ত্যা মামভিজানাতি—গীতা। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—শ্রীমদ্ভাগবত।" তাহা হইলে বিদ্বান্-শব্দের অর্থ হইল ভক্তিমান্, প্রেমভক্তিমান্।

উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে এক স্বর্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ পাওয়া গেল। এই গৌরবর্ণ পুরুষ হইতেছেন ব্রহ্মযোনি—পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু তাঁহার বর্ণ টী—বাহিরের কান্তিটী—হইতেছে স্বর্ণবর্ণ। এই শ্রুতিবাক্য হইতে আরও জানা গেল—এই স্বর্ণবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রেই দ্রষ্টা জীব প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাঁহার পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্ম—এমন কি অসুরত্ব পর্য্যন্ত—বিদূরিত হয়; তিনি সম্যক্‌রূপে মায়ামুক্ত হইয়া যায়েন এবং তিনি সেই স্বর্ণবর্ণ পুরুষের সঙ্গে পরম-সাম্য লাভ করেন। পরম-সাম্য-লাভের তাৎপর্য্য কি? এক অর্থ হইতে পারে—দ্রষ্টাও স্বর্ণবর্ণ পুরুষ—পরব্রহ্ম—হইয়া যায়েন; কিন্তু এই অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারেনা। যেহেতু, অণুচিৎ জীব কখনও বিভুচিৎ পরব্রহ্ম হইতে পারেনা। আর এক অর্থ হইতে পারে—প্রভাবে পরম-সাম্য। স্বর্ণবর্ণ পুরুষের যে প্রভাবে

তাঁহার দর্শনমাত্রেই জীব—পাপী জীবও—তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি লাভ করেন, সেই প্রভাবের সহিত দ্রষ্টা পরম-সাম্য লাভ করেন ; অর্থাৎ তাঁহার দর্শনেও অপর জীব প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন, সম্যক্‌রূপে মায়ামুক্ত হইতে পারেন এবং বিধৌত-কর্ম্মা হইতে পারেন। এই অর্থ গ্রহণ করিলে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে পারেনা। সুতরাং এই অর্থই গ্রহণীয়।

পূর্ব্ব আলোচনায় উপপুরাণের প্রমাণে জানা গিয়াছে—স্বয়ংভগবান্ বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হয়েন—পাপহত লোকদিগকেও প্রেমভক্তি-দানের নিমিত্ত। আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণে জানা গিয়াছে—বিশেষ কলিতে তিনি অবতীর্ণ হয়েন অকৃষ্ণ বা গৌরবর্ণে এবং তখন তিনি হয়েন সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ—তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গই তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদের কাজ করে, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির—প্রেমভক্তি-দানের—সহায়তা করে। অঙ্গ এবং উপাঙ্গের দর্শনেই, সেই গৌরবর্ণ পুরুষের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনেই, যদি কেহ প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদের কাজ করিয়াছে। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীমদ্-ভাগবতের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ"-শব্দের তাৎপর্য্য যাহা, উল্লিখিত মুণ্ডক-শ্রুতিবাক্যের "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং পুরুষং * * ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই। এই শ্রুতিবাক্যের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রের সঙ্গতি দৃষ্ট হইতেছে। অধিকন্তু, এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, এই গৌরবর্ণ পুরুষের দর্শনে যিনি প্রেমভক্তি লাভ করেন, তাঁহার দর্শনেও অপরে তদ্রূপ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

———

শাস্ত্রবাক্যালোচনার সারমর্ম্ম



এ-পর্য্যন্ত নানাবিধ শাস্ত্রবাক্যের আলোচনায় যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই :—

(১) শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, সুতরাং স্বরূপতঃ হ্লাদিনী।

(২) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা।

(৩) একাত্মা হইয়াও শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে গোলোকে দুইরূপে বিরাজিত, লীলায় বিলসিত।

(৪) দুইরূপে বিরাজিত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একত্বপ্রাপ্ত হইয়া গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপে বিরাজিত।

(৫) শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব (প্রেম) ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন; তাই তিনি রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ।

(৬) গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ ভক্তভাবময়।

(৭) যেই দ্বাপরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে (যাহাকে বিশেষ কলিযুগ বলা হয়, সেই কলিযুগে) সেই গৌরবর্ণ কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন।

(৮) ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ আপামর-সাধারণকে নির্ব্বিচারে প্রেমভক্তি দান করেন।

(৯) ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া গৌরবর্ণ ভগবান্ সন্ন্যাস গ্রহণও করেন।

(১০) গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনেই পাপীজীবও প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

(১১) গৌরবর্ণ ভগবানের দর্শনে যিনি প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার দর্শনেও অপর লোক তদ্রূপ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

(১২) সেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের নিজস্ব স্বরূপগত কার্য্য হইল—শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন। যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি প্রেমভক্তিও বিতরণ করেন।

(১৩) সেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বর্ত্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া গত দ্বাপর-যুগেই করভাজন-ঋষি বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিঃ"—ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বা রাধাভাবাবিষ্ট গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্"-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র-বহির্ভূত কোনও কথা তিনি বলেন নাই।

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর আরও বলিয়াছেন—সেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ বর্ত্তমান্ কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবই সেই গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, শ্রীচৈতন্যদেবই শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কিনা ?

শচীনন্দনের গৌরবর্ণ-স্বয়ংভগবত্তা-বিচার



পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি, দ্বিভুজ। "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৪।১১।২ ॥ সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ গোপালতাপনীশ্রুতি, পূর্ব্বতাপনী ॥ ২।১॥—তিনি কমলনয়ন, নবজলধরবর্ণ, পীতবসন, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, বনমালী ও ঈশ্বর।" গৌরবর্ণেও তিনি নরাকৃতি, দ্বিভুজ; পার্থক্য কেবল বর্ণে ও ভাবে। উভয় স্বরূপের লীলাও নরলীলা। তাঁহারা অপ্রকটেও নরবপু এবং নরলীল, প্রকটেও নরবপু এবং নরলীল। তাঁহারা যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত জন্মলীলার অভিনয় করিয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অভিনয় বলা হইল এজন্য যে, স্বরূপতঃ তাঁহাদের জন্ম নাই, থাকিতেও পারেনা; যেহেতু, তাঁহারা অজ, নিত্য, অনাদি। কিরূপে তাঁহারা জন্মলীলার অভিনয় করেন, শ্রীকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অজ এবং অনাদি বলিয়া বাস্তবিক তাঁহার কোনও জন্মদাতা পিতা বা গর্ভধারিণী মাতাও নাই, থাকিতেও পারে না। কিন্তু তিনি রসস্বরূপ বলিয়া যে-সকল রস আস্বাদন করেন, তাহাদের মধ্যে একটী হইতেছে বাৎসল্যরস। পিতামাতাই বাৎসল্যরসের মুখ্য আশ্রয়। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অনাদি পরিকরগণের মধ্যে দুইজন আছেন—শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা—যাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান; ইহা তাঁহাদের দৃঢ়া প্রতীতি। তাঁহাদের বাৎসল্যের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরও দৃঢ়া প্রতীতি এই যে, তিনি নন্দ-যশোদার সন্তান। নন্দ-যশোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ হইতেছে কেবল দৃঢ়-প্রতীতিজাত, জন্মগত সম্বন্ধ নহে। শ্রীকৃষ্ণ যখন

ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি স্বীয় পরিকরদের সহিতই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রথমে তিনি পিতা-মাতাকে—নন্দ-যশোদাকে—অবতারিত করেন ; তাহার পরে তাঁহাদের যোগে তিনি অবতীর্ণ হয়েন। পিতামাতার শুক্র-শোণিতে যেমন মানুষের জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তদ্রূপ নহে। প্রথমে তিনি পিতার হৃদয়ে জ্যোতিঃরূপে বা আনন্দরূপে আবির্ভূত হয়েন, এই জ্যোতিঃ বা আনন্দ তখন মাতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তখন হইতেই মাতার দেহে প্রাকৃত গর্ভবতী নারীর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। যথাসময়ে তিনি মাতার দেহ হইতে নরশিশুর আকারে নিজেকে প্রকট করেন। লোকে মনে করে, প্রাকৃত নরশিশুর যে-ভাবে জন্ম হয়, তাঁহারও সেই ভাবেই জন্ম হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। "জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যম্'-ইত্যাদি গীতাবাক্যে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গৌরবর্ণ-স্বরূপের আবির্ভাবও এইভাবেই হইয়া থাকে।

যাহাহউক, নরশিশুরূপে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া, যাহারা ভগবানের তত্ত্বাদি অবগত নহে, তাহারা স্বয়ংভগবান্‌কেও সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে করে। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
—গীতা ৯।১১

এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ ভগবান্‌কে চিনিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কেবল অলৌকিকী শক্তিদ্বারাও ভগবৎ-স্বরূপকে নির্ণয় করা যায় না ; কেননা, কোনও কোনও জীবতত্ত্ব সাধক-মহাপুরুষের মধ্যেও ভগবৎ-কৃপায় কিছু কিছু অলৌকিকী শক্তি দৃষ্ট হয়।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—প্রভু, "কেমনে জানিব—কলিতে কোন্ অবতার ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।২৯১॥" তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

—অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি।
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ।
আমা সভা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥
অবতার নাহি কহে—"আমি অবতার"
মুনিসব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥
স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥
আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ-লক্ষণ ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২০।২৯২-৯৬

—যিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণতঃ তিনি নিজে বলেন না যে, তিনি ভগবদবতার। যে ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, শাস্ত্রে তাঁহার উল্লেখ থাকে; কোন্‌যুগে তিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত থাকে। শাস্ত্রের উক্তির সঙ্গে লক্ষণাদি মিলাইয়াই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভগবদবতার নির্ণয় করেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা জানা প্রয়োজন। কোনও ভগবৎ-স্বরূপ একযুগে একবারই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, একাধিকবার অবতীর্ণ হওয়ায় কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। স্বয়ংভগবান্ এক কল্পে (ব্রহ্মার এক দিনে) একবার অবতীর্ণ হয়েন। যুগাবতার অবশ্য প্রতিযুগেই অবতীর্ণ

হয়েন ; তাহাও মাত্র একবার। যে যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার স্বয়ংভগবানের মধ্যেই থাকেন, তিনি স্বতন্ত্রভাবে, স্বয়ংভগবানের অবতরণ-সময়েও অবতীর্ণ হয়েন না, স্বয়ংভগবানের অন্তর্দ্ধানের পরেও আর সেই যুগে অবতীর্ণ হয়েন না।

যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্রের যোগে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই শাস্ত্রকথিত "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" কিনা, গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ কিনা, রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ কিনা, তাহাই বিবেচ্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন হইতে গৌরবর্ণ-স্বয়ংভগবানের যে সমস্ত লক্ষণ জানা গিয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণ যদি শ্রীচৈতন্যদেবে বিদ্যমান্ থাকে, তাহা হইলেই তাঁহাকে শাস্ত্র-কথিত ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, অন্যথা নহে। এক্ষণে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

দৈহিক লক্ষণ

(১) ভগবান্ জন্মলীলার ভিতর দিয়া মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও কতকগুলি **শারীরিক লক্ষণে** সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁহার **বৈশিষ্ট্য** থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল।

মানুষের দেহ দৈর্ঘ্যে হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত ; বিস্তারেও—দুই হস্ত প্রসারিত করিলে একহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্তও—হয় নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত। বর্ত্তমান্ কল্পের ব্রহ্মাও ছিলেন নিজ হাতের সাড়ে

তিন হাত—সাত বিঘত ; তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতিতে স্বয়ংব্রহ্মাই বলিয়া গিয়াছেন—"সপ্তবিতস্তিকায়ঃ। ১০।১৪।১১॥" জগতে কোনও কোনও লোককে চারিহাত (ছয় ফিট্) লম্বাও দেখা যায় ; কিন্তু প্রমাণমাপে চারিহাত হইলেও তাহার নিজের হাতে তাহার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাতই হইয়া থাকে। ভগবান্ কিন্তু এরূপ নহেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।১৪।১১-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় বলা হইয়াছে, ভগবানের বিগ্রহ হয় সাড়ে চারি হাত। কোনও কোন স্থলে চারি হাতের কথাও পাওয়া যায়। তাহা হইলে, যে ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন, মানুষের মত দ্বিভুজ হইলেও তাঁহার দেহ মানুষের দেহের ন্যায় সাড়ে তিন হাত হইবে না,—হইবে চারি হাত, কি সাড়ে চারি হাত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দেহও ছিল দৈর্ঘ্য-বিস্তারে নিজের হাতের চারি হাত লম্বা।

দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
"ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল" হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।৩৩-৩৪

এস্থলে "মহাপুরুষ"-শব্দে পুরুষোত্তম ভগবানকেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১০।৪০।৪ শ্লোকে অক্রূরোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকেই মহাপুরুষ বলা হইয়াছে—"মহাপুরুষমীশ্বরম্॥" আবার "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্ন-মিত্যাদি" শ্রীভাগবত ১১।৫।৩৩ শ্লোকে এবং অন্যান্য স্থানেও ভগবান্‌কে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে।

কর-চরণ-চিহ্নাদিতে মানুষ অপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য থাকে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও এই বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার চরণে "শোভে

ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১৪।৫॥" এই সকল চিহ্ন কোনও মানুষের চরণে থাকে না। শিশু শ্রীচৈতন্যদেবের কর-পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন—"নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্তচরণ। এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১৪।১৩॥"

উল্লিখিত লক্ষণ হইতে জানা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জীবতত্ত্ব ছিলেন না; তিনি ছিলেন ঈশ্বর-তত্ত্ব, ভগবৎ-স্বরূপ। কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেই যে তিনি স্বয়ংভগবান্ হইবেন, তাহা নহে। স্বয়ংভগবানের এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই থাকে না। এই সকল বিশেষ লক্ষণের কোনও একটী লক্ষণ কোনও ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে—তিনি স্বয়ংভগবান্। শ্রীচৈতন্যদেবে স্বয়ংভগবানের কোনও বিশেষ লক্ষণ আছে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে।

---

(২) শ্রীচৈতন্যদেবে স্বয়ংভগবত্তার লক্ষণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণের দ্বারা, সাধারণ লক্ষণের দ্বারা নহে।

স্বয়ংভগবানেরও কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে, যাহা অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপের নাই। এই সমস্ত বিশেষ লক্ষণের দ্বারাই স্বয়ংভগবানের পরিচয় হইতে পারে। সমস্ত বিশেষ লক্ষণ সকল সময়ে হয়তো প্রকটিত হয় না, লক্ষ্য করাও যায় না। দুই একটী বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট

হইলেও স্বয়ংভগবানের পরিচয় হইতে পারে ; যেহেতু, এই দুই একটী বিশেষ লক্ষণও স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে থাকেনা।

(ক) স্বয়ংভগবানের একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে এই যে—তাঁহার মধ্যে অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত। যেহেতু, "একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ।—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। বৃহদ্ভাগবতামৃত ॥ ২।৪।১৮৬ ॥" লঘুভাগবতামৃতের শ্রীকৃষ্ণামৃত হইতে জানা যায়—

স্যুর্মহান্তোহতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ॥
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।
তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥
ইত্যেতে পরব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাম্।
স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥
অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ।
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ॥
এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যয়মবস্থিতঃ॥

—শ্রীকৃষ্ণামৃতম্ ॥ ৩৬৮-৭২ ॥

—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকাচতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ), পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহ (পরব্যোমস্থ বাসুদেবাদি), পুরুষাদি অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরনারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদি—ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও এই সকল কথাই বলিয়া গিয়াছেন—

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৯-১১

শচীনন্দন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে যে স্বয়ংভগবত্ত্বার এই বিশেষ লক্ষণটী বিদ্যমান ছিল, তাহা তিনি বহুস্থলে দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন তিনি দিগম্বর শিশু, তখন একদিন, তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথমিশ্রের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। রাত্রিকাল। মিশ্রবর তাঁহার রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিলেন; রন্ধন করিয়া বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেব বালগোপালের ভোগ নিবেদন করিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন—

সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধূলাময় সর্ব্বঅঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
একগ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে॥

—শ্রীচৈ, ভা, আদি ৩য় অঃ॥

দেখিয়া ভোগ নষ্ট হইল ভাবিয়া বিপ্র "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। জগন্নাথমিশ্র আসিয়া দেখেন—বালক বিপ্রের নিবেদিত অন্ন খাইতেছেন,

আর হাসিতেছেন। ক্রোধাবেশে তিনি বালককে মারিতে গেলেন, তৈর্থিক বিপ্র বাধা দিলেন। মিশ্রের কাকুতি-মিনতিতে বিপ্র পুনরায় রন্ধনে সম্মত হইলেন। বিপ্র রন্ধন করিতেছেন। চঞ্চল বালককে প্রতিবেশীর গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। রন্ধনান্তে বিপ্র পুনরায় ভোগ নিবেদন করিয়া বালগোপালের ধ্যান করিতেছেন, তখন সেই বালক—

মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে॥
অলক্ষিতে একমুষ্টি অন্ন লই করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু—দেখে বিপ্রবরে॥

—শ্রীচৈ, ভা, আদি ৩য় অঃ।

দেখিয়া বিপ্র "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। বালক দৌড় দিয়া পলাইয়া গেলেন। ক্রোধভরে জগন্নাথমিশ্র লাঠি লইয়া শিশুকে তাড়াইয়া গেলেন। বালক এক ঘরে গিয়া পলাইলেন। দুইবারই ভোগ নষ্ট হইল, অতিথি বিপ্রের আহার হইল না ভাবিয়া সকলেই দুঃখিত। বিপ্র বলিলেন—"আমি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি; সকল দিন তো আমার অন্ন জুটে না। আজও ভগবান্ আমার ভাগ্যে অন্ন মিলান নাই। কেহ দুঃখিত হইও না; ঘরে ফল-মূল কিছু থাকিলে দাও, তাহাই আহার করিব।" এমন সময় প্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিপ্র মুগ্ধচিত্তে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—ইনি জগন্নাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিশ্বরূপের অনুনয়-বিনয়ে বিপ্র তৃতীয় বার রন্ধন করিতে সম্মত হইলেন। চঞ্চল বালককে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল; মিশ্র ঘরের দ্বারে বসিয়া আছেন। বিপ্র এবারেও ভোগ নিবেদন করিয়া ধ্যান করিতেছেন। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। যে-ঘরে

বালককে রাখা হইয়াছিল, সেই ঘরের সকলে, এমন কি দ্বারস্থ মিশ্রবরও —"সভেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়।" তখন—

যে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই-স্থানে শ্রীশচীনন্দন॥
বালক দেখিয়া বিপ্র করে "হায় হায়।"
সভে নিদ্রা যায়ে, কেহো শুনিতে না পায়॥
প্রভু বোলে "অয়ে বিপ্র! তুমি ত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন, কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমাস্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখা আমি॥"
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অষ্টভুজরূপ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্বঅঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
নবগুঞ্জা বেঢ়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর॥

অপূর্ব্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেই খানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে ॥
গোপ-গোপী গাবীগণ চতুর্দ্দিগে দেখে।
যত ধ্যান করে, তাই দেখে পরতেকে ॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥

—শ্রীচৈ, ভা, আদি ৩য় অঃ

প্রভুর হস্তস্পর্শে বিপ্র চেতনা পাইলেন; কিন্তু মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না; পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। দেহে অশ্রু-কম্প-পুলক। প্রভুর চরণ ধরিয়া বিপ্র উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বিপ্র, তুমি অনেক জন্ম ধরিয়া আমার সেবা করিতেছ। আমি যখন দ্বাপরে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখনও তুমি তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নন্দালয়ে উপনীত হইয়া আমাকে ভোগ নিবেদন করিয়াছিলে; আমি তখনও তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়া এই রূপ দেখাইয়াছিলাম।"

এইরূপে শ্রীশচীনন্দন তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে যাহা দেখাইয়াছিলেন, তাহা ব্যতীতও অনেককে তিনি অনেক ভগবৎ-স্বরূপ দেখাইয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষণ (চৈ, ভা, মধ্য ১০), মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি এবং শ্রীকৃষ্ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২), বরাহ (চৈ, ভা, মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ, ভা, মধ্য ৬), শিব (চৈ, ভা, মধ্য ৮), বলরাম (চৈ, চ, ১।১৭।১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভগবতী (চৈ, ভা, মধ্য ৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দকে এবং সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য

এবং রাজা প্রতাপরুদ্রকেও ষড়্ভুজরূপ দেখাইয়াছেন। গোদাবরীতীরে শ্রীল রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাসরূপের স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। (বিশেষ বিবরণ লেখকের "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

(খ) স্বয়ংভগবত্তার আর একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে—প্রেমদাতৃত্ব।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই জীবের পক্ষে মঙ্গল-প্রদ; কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেমদান করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল মানুষকেই প্রেমদান করিতে পারেন, তাহা নহে; তিনি লতাগুল্মাদিকেও—স্থাবর-জঙ্গম সকলকেই—প্রেমদান করিতে সমর্থ।

সন্তবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

—লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড॥ ৫।৩৭

স্বয়ংভগবত্তার এই লক্ষণটীও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবে অতি সমুজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান ছিল। প্রেমদাতা বলিয়াই তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

—কৃষ্ণচৈতন্যনামক গৌরকান্তি কৃষ্ণকে নমস্কার, যিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়া মহাবদান্য।

সাধন-ভজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া তিনি আপামর-সাধারণকে, এমন কি মহাপাপীকে পর্য্যন্ত, প্রেমদান

করিয়াছেন। তাঁহার এই গুণটীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহাকে ভক্তিকল্পতরুরূপে এবং ভক্তিকল্পতরুর রক্ষক এবং পোষক মালাকাররূপেও বর্ণন করিয়াছেন; তাঁহার কৃপাবারি-সিঞ্চনে এই কল্পতরুর সর্ব্বাঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল জন্মিত, তিনি সেই ফল বিতরণ করিতেন।

শ্রীচৈতন্য-মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥

* * * *

উড়ুম্বরবৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥

* * * *

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি, জানে "দিব" মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৯।৭, ২৩, ২৫-২৮

কল্পতরুর নিকটে যাহা চাওয়া যায়, কেবলমাত্র তাহাই পাওয়া যায়; যাহা চাওয়া হয় না, তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এক অদ্ভুত কল্পতরু। "মাগে বা না মাগে"—সকলকেই তিনি প্রেম দিয়াছেন—যে প্রেম ব্রহ্মাদির পক্ষেও দুর্ল্লভ, যে প্রেমের জন্য

লুব্ধ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ গোকুলবাসীদিগের চরণ-রজের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মাও সত্যলোক ত্যাগ করিয়া গোকুলের অরণ্যে তৃণ-গুল্মাদি কোনও এক যোনিতে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্‌ঘ্রিরজোঽভিষেকম্। ইত্যাদি। শ্রীভা, ১০।১৪।৩৪ ॥"

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে নবদ্বীপে অবস্থান-কালে প্রভু জগাই-মাধাই, শ্রীবাস-পণ্ডিতের বস্ত্র সেলাই করিতেন—এইরূপ এক যবন-দরজী, শ্রীবাস-পণ্ডিতের চারিবৎসর-বয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী প্রভৃতি বহু লোককে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া উন্মত্ত করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পরে বৃন্দাবন-গমনের পথে ঝারিখণ্ডের ভিল্লপ্রায় লোকদিগকেও কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া প্রভু কৃতার্থ করিয়াছেন, ঝারিখণ্ডের বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী—স্থাবর-জঙ্গম—সকলকেই তিনি নাম-প্রেম দিয়া ধন্য করিয়াছেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া ঝারিখণ্ডের ব্যাঘ্র-মৃগ-হস্তী-আদিও কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য করিয়াছে, তাহাদের মুখেও কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইয়াছে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে "লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি", ঝারিখণ্ডের পথে প্রভু তাহা দেখাইয়াছেন। দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ-কালে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিয়া অসংখ্য লোককে প্রভু প্রেমাপ্লুত করিয়াছেন; এমন কি, প্রভুর দর্শনমাত্রেই লোক কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া বাহ্যস্মৃতিহারা হইয়া অশ্রু-কম্প-পুলকাদিদ্বারা বিভূষিত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক হাসিয়াছে, কান্দিয়াছে, নাচিয়াছে, গাইয়াছে। আবার অদ্ভুত ব্যাপার এই—প্রভুর দর্শনে যাঁহাদের উল্লিখিতরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাঁহাদের দর্শনেও আবার অন্য লোকের সেইরূপ অবস্থা এবং তাঁহাদের দর্শনেও অপরের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। এইরূপে প্রভু মুণ্ডক-শ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা

বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”—এই পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের সত্যতা জাজ্জ্বল্যমান্‌ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

(প্রভুর প্রেমদান-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা লেখকের “শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য”-নামক গ্রন্থের “প্রেমবিতরণে করুণার বৈশিষ্ট্য”-নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত স্বয়ংভগবত্তার বিশেষ লক্ষণ দুইটীই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিতেছে—শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংভগবান্।

শাস্ত্র-প্রোক্ত অন্যান্য লক্ষণও যে শ্রীচৈতন্যদেবে বিদ্যমান ছিল, তাহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে।

---

(৩) শাস্ত্রকথিত অন্যান্য লক্ষণ

কলিযুগে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবানের অন্য যে সকল লক্ষণের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সে সমস্তও স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবে বিরাজিত ছিল।

(ক) গৌরবর্ণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্”-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে, বর্ত্তমান কলির উপাস্যরূপে যিনি অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া গত দ্বাপরেই করভাজন-ঋষি বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বর্ণ হইবে “অকৃষ্ণ—পীত।” শ্রীমদ্‌ভাগবতের “আসন্ বর্ণাঃ”-শ্লোক হইতেও জানা যায়, বিশেষ-কলিতে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবানের বর্ণও “পীত”। মহাভারতেও ভগবানের একটী নাম পাওয়া যায় “হেমাঙ্গ।” “পীত” এবং “হেমাঙ্গ” শব্দদ্বয়ে একই অর্থ সূচিত করে—সোনার মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।

শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণও ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।

তথিলাগি পীতবর্ণে চৈতন্য অবতার॥
তপ্তহেম-সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।৩১-৩২

পদকর্ত্তাও গাহিয়াছেন—"অপরূপ গোরা তনু, কষিত-কাঞ্চন জনু।"

এজন্যই শ্রীচৈতন্যদেবকে—গৌর, গৌরসুন্দর, গৌরহরি, গৌরকৃষ্ণ, গৌর-ভগবান্ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

(খ) কলিতে অবতরণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, "অকৃষ্ণ—গৌর"-বর্ণ স্বয়ংভগবান্ এই বর্ত্তমান কলিতে অবতীর্ণ হইবেন। পুর্ব্বোদ্ধৃত উপপুরাণের প্রমাণ হইতেও জানা যায়,—পাপহত লোকদিগকে প্রেম-দানের উদ্দেশ্যে স্বয়ংভগবান্ বিশেষ কলিতেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন—১৪০৭শকে, বর্ত্তমান্ কলিযুগে। গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ত্তমান্ কলিও বিশেষ কলি।

(গ) সন্ন্যাস। উপপুরাণ বলিয়াছেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-দানের জন্য বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরও ১৪৩১ শকের মাঘমাসের শেষ তারিখে পূর্ণিমা-তিথিতে কাটোয়াতে শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন (লেখক-সম্পাদিত গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের তারিখ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সন্ন্যাসের সময়েই তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নাম প্রকটিত হয়। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের" সংক্ষেপই "শ্রীচৈতন্য।"

(ঘ) **ভক্তভাব।** শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং মহাভারতের প্রমাণে জানা গিয়াছে—গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবানের মধ্যে ভক্তভাব প্রকটিত।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেও ভক্তভাব প্রকটিত ছিল। ভক্তভাবে, কৃষ্ণভক্তের ন্যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন (সংখ্যারক্ষণ-পূর্ব্বক নামকীর্ত্তনও) করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদিও শ্রবণ, বর্ণন ও কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণঃ" এবং মহাভারতের "সুবর্ণবর্ণঃ" শব্দদ্বয়ের সার্থকতাই মহাপ্রভুতে দৃষ্ট হইয়াছে।

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে ॥
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজসুখে ॥
'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের এই দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণবিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন্ ॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।৪২-৪৩

(ঙ) **মহাভারতোক্ত অন্যান্য লক্ষণ।** "হেমাঙ্গ" ভগবানের অন্যান্য লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাভারত-বাক্যে জানা যায়—তিনি বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, শম, শান্ত, নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সম্বন্ধেও শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—

দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥
"ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল" হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥
আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশুবদন ॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥

চন্দনের অঙ্গদ-বালা, চন্দনভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নামের গণন॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।৩৩-৩৮

পূর্ব্ববর্ত্তী (২)-অনুচ্ছেদে যে দুইটী লক্ষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই দুইটীই হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্ত্বার লক্ষণ। পূর্ব্ববর্ত্তী (১) এবং (৩) অনুচ্ছেদে আলোচিত লক্ষণগুলি হইতেছে আনুষঙ্গিক বা সাধারণ লক্ষণ, স্বয়ংভগবত্ত্বার বিশেষ লক্ষণ নহে। (২) অনুচ্ছেদে আলোচিত লক্ষণেই জানা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ ছিলেন। তিনি যে গৌরবর্ণও ছিলেন, তাহাও দেখান হইয়াছে। তাঁহার এই গৌরবর্ণের হেতু কি, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার সহিত একত্ব-প্রাপ্তিই তাঁহার গৌরবর্ণের হেতু।

——

শ্রীচৈতন্য—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের আলোচনায় বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান্ কলির উপাস্য গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কেবল যে তাঁহার স্বয়ংভগবত্ত্বার লক্ষণই প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই নহে। তিনি যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, তাহাও গোদাবরীতীরে রায়রামানন্দের নিকটে প্রকটিত করিয়াছেন।

প্রভু যখন দক্ষিণ-ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ ছিলেন তৎকালীন উড়িষ্যার স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা; কিন্তু বিষয়ী হইলেও তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত, মহা-প্রেমিক, মহা পণ্ডিত, কৃষ্ণভক্তি-রসজ্ঞ। মহাপ্রভু সেই স্থানে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতেন, সন্ধ্যাকালে রামানন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। কয়েক রাত্রি প্রভু তাঁহার সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় প্রভু ছিলেন শ্রোতা, আর রামানন্দ ছিলেন বক্তা।

প্রভুর একটী স্বভাব ছিল এই যে, সম্ভবতঃ ভক্তভাবময় বলিয়া, তিনি প্রায় সকল সময়েই আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন। "ছন্নঃ কলৌ" কিনা! কিন্তু প্রেমিক ভক্তের নিকটে ভগবানের আত্ম-গোপন-প্রয়াস প্রায়শঃই সফল হয় না। প্রেমিক ভক্ত প্রেম-বলে আত্ম-গোপন-চেষ্টিত ভগবান্‌কে চিনিয়া ফেলেন। "লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৩।৭১॥" রামানন্দের সঙ্গে আলোচনার সময়েও প্রভু আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেন। তথাপি স্বীয় অসাধারণ প্রেমের প্রভাবে রামানন্দ যেন সময়ে সময়ে প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি পাইতেন। প্রভুর স্বরূপ যেন সময় সময় রামানন্দের প্রেমাঞ্জন-বিচ্ছুরিত নয়নের সাক্ষাতে স্ফুরিত হইত; কিন্তু তাহা অতি অল্পসময়ের জন্য—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াই যেন তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইত। রামানন্দ যেন আলেয়ার মতই প্রভুর স্বরূপের দর্শন পাইতেন। তাহার কারণ এই যে, প্রভুর ইচ্ছা নয়—আলোচনার মধ্যেই রামানন্দ তাঁহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভব পায়েন; তাহা হইলে আর আলোচনা চলিবে না।

যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।
রায়ের মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১০২-৩

যাহা হউক, আলোচনা শেষ হইলে প্রভুর ইচ্ছা হইল, রামানন্দকে তাঁহার স্বরূপ দেখাইবেন। একদিন রামানন্দ গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিলেন—সন্ন্যাসীকে; কিন্তু উঠিয়া দেখেন প্রভুর সন্ন্যাসিরূপের স্থলে আর একটী অপূর্ব্ব রূপ—কমল-নয়ন শ্যামসুন্দর বংশী-বদন, তাঁহার সাক্ষাতে কাঞ্চন-প্রতিমা-সদৃশী শ্রীরাধা; শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তিতে শ্যামসুন্দরের সর্ব্ব-অঙ্গ আচ্ছাদিত। দেখিয়া রামানন্দের মনে সংশয় জাগিল। তিনি প্রভুর নিকটে স্বীয় সংশয়ের কথা খুলিয়া বলিলেন। প্রভু—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২২০-২৪

আবার প্রভু আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন ; এই বারের চেষ্টা যেন রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে। উলঙ্গ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যেরই মাধুর্য্য অধিক। রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২২৫-২৮

—রামানন্দ, তোমার প্রেমের প্রভাবেই তুমি এইরূপ দেখিতেছ। আমি সন্ন্যাসীই, অপর কিছু নহি। তুমি যদি স্থাবর-জঙ্গমের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে, প্রেমের প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গমের স্বরূপ তুমি দেখিতে না, দেখিতে তোমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকেই।

এইবার রামানন্দ প্রভুর চাতুরীতে ভুলিলেন না। প্রভুর কৃপায় রায়ের চিত্তে প্রভুর স্বরূপের অনুভব জন্মিয়াছে। তিনি বলিলেন—

—তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার॥

—শ্রীচৈ. চ, ২।৮।২২৯-৩২

রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন; হাসিয়া রামানন্দকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন।

তবে হাসি প্রভু তারে দেখান স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২৩৩

প্রভু রামানন্দরায়কে নিজের স্বরূপ যাহা দেখাইলেন, তাহা হইতেছে —রসরাজ ও মহাভাব, এই দুইয়ের মিলিত একটী রূপ। রসরাজ হইতেছেন—অখিল-রসামৃত-বারিধি শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। আর, মহাভাব হইতেছেন—মহাভাব-স্বরূপা, মহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধিকা। সুতরাং, "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" হইলেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ। ইহাই প্রভুর স্বরূপ।

রায়রামানন্দ প্রভুর এই স্বরূপ দেখিয়া আনন্দের আধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২৩৪

প্রভুর হস্তস্পর্শে রামানন্দের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল; তখন তিনি দেখিলেন —যেই সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী; "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" আর নাই। রামানন্দ ইহাতে বিস্মিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং যে-স্বরূপটী তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, নিজমুখে তাঁহার পরিচয়ও দিলেন।

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২৩৮

—রামানন্দ! আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌরবর্ণ নহে; তবে যে আমাকে গৌরবর্ণ দেখাইতেছে, তাহার কারণ—রাধাঙ্গ-স্পর্শন। শ্রীরাধাও গোপেন্দ্রসুত ব্যতীত অপর কাহাকেও স্পর্শ করেন না।

ভঙ্গীতে প্রভু বলিলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং তাঁহার নিজস্ব বর্ণ হইতেছে—নবজলধর-শ্যাম, গৌর নহে। গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রতি শ্যাম অঙ্গকে স্পর্শ (আলিঙ্গন) করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি (শ্যামসুন্দর) গৌরসুন্দর হইয়াছেন।

প্রভু আরও বলিলেন—

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২৩৯

—শ্রীরাধার ভাবদ্বারা (মাদনাখ্য মহাভাবদ্বারা) স্বীয় আত্মাকে (দেহকে) এবং মনকে (মনের উপলক্ষণে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে) ভাবিত (পরিষিঞ্চিত) করিয়া আমি (ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি।

কি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া—একত্বপ্রাপ্ত হইয়া—গৌর হইয়াছেন, প্রভু তাহাও বলিলেন—স্বীয় (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের) মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য

মহাভাবের আশ্রয় হইতে না পারিলে তাহা সম্ভব হয়না এবং শ্রীরাধার সহিত একত্ব প্রাপ্ত না হইলেও শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হওয়া যায় না। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার শ্যাম অঙ্গ শ্রীরাধার গৌর অঙ্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে —কৃষ্ণবর্ণ-শ্রীকৃষ্ণ কান্তিতে অকৃষ্ণ (ত্বিষাকৃষ্ণ) হইয়াছেন, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইয়াছেন। আর ভিতরেও, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হইয়াছে, আর এই প্রেমরসের দ্বারা তাঁহার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ—সমস্তই সম্যক্‌রূপে পরিনিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে; তাহাতেই তিনি শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপের আরও একটী বৈশিষ্ট্যের কথা জানা গেল—তাহা হইতেছে গৌরের মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য।

"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" দেখিবার পূর্ব্বেই রায়রামানন্দ শ্যামসুন্দর বংশীবদনের সম্মুখে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাসদৃশী শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তখন শ্যামসুন্দর-শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন-রূপই প্রকটিত হইয়াছিল; যেহেতু, "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন-মোহনঃ।" এই মদনমোহন-রূপের দর্শনেও রামানন্দ নিশ্চয়ই অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি মূর্চ্ছিত হয়েন নাই। ইহাতে বুঝা যায়—মদনমোহন-রূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিল। কিন্তু তিনি যখন প্রভুর স্বরূপ—"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ"—দেখিলেন, তখন আনন্দের আধিক্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—এই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের দর্শন-জনিত আনন্দের উন্মাদনা সম্বরণ করার শক্তি রামানন্দের ছিলনা। সুতরাং "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" যে মদনমোহন-রূপ অপেক্ষাও অধিকতর এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের বিকাশ, তাহা সহজেই

বুঝা যায়। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এই "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপেই।"

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত—তরঙ্গায়িত—করিতে পারে একমাত্র পরিকর-ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যে মাধুর্য্যেরও ততটুকু বিকাশ সম্ভব। শ্রীরাধিকাতে প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়া একমাত্র শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—মদনমোহন-রূপের বিকাশ—সম্ভব। আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্য যত ঘনিষ্ট হইবে, মাধুর্য্যের বিকাশও তত বেশীই হইবে। কিন্তু ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য যতই ঘনিষ্ট হউক না কেন, তাঁহাদের দুই ভিন্ন দেহই থাকে। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" সান্নিধ্য এত ঘনিষ্ট, এত নিবিড় যে, তাঁহাদের ভেদ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই রূপে যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতম রূপে—মদন-মোহনরূপ অপেক্ষাও অধিকরূপে—বিকশিত, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আবার শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যেমন বর্দ্ধিত হয়. এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমও তেমনি বর্দ্ধিত—উচ্ছ্বসিত—হইতে থাকে, আবার শ্রীরাধার এই উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তজ্জনিত শ্রীরাধার অঙ্গে তরঙ্গায়িত আনন্দ-লহরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্দ্ধিত মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এবং শ্রীরাধার প্রেম এবং আনন্দ-লহরী পরস্পর যেন জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একথা শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই কবিরাজগোস্বামী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১২৪

সুতরাং "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ"-শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে আছে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ, আর আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, সেই শ্রীরাধার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্যহেতু পরস্পর হুড়াহুড়ি করিয়া বর্দ্ধনশীল উভয়ের মাধুর্য্যের বিকাশ। তাই এই অপূর্ব্ব রূপের মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়, বুঝিবা স্বয়ং মদনমোহনেরও মনোমোহন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভে বলিয়াছেন—যুগলিত রাধাকৃষ্ণ পরম-স্বরূপ। এই "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপেই" তাঁহাদের যুগলিতত্বের চরমতম বিকাশ। এই জন্যই বোধ হয়, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর বলিয়াছেন —"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই স্বরূপ। যে স্বরূপে শক্তির বিকাশ যত বেশী, সেই স্বরূপের মহিমাও তত বেশী। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপে কেবল মাত্র অমূর্ত্ত শক্তিরই পূর্ণতম বিকাশ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শক্তির অবস্থিতি দুই রকম—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মূর্ত্তশক্তি নাই, মূর্ত্ত শক্তি আছেন শ্রীরাধারূপে শ্রীকৃষ্ণের বাহিরে। আর "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্ত শক্তির এবং অমূর্ত্ত-শক্তির একই রূপে সম্মিলন। তাই এই রূপে স্বরূপ-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ, এই রূপেই পরম-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। স্বরূপদামোদর তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিতে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের এই উক্তিটীর তাৎপর্য্য অন্যভাবেও বিবেচিত হইতে পারে। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "আনন্দস্বরূপ—আনন্দং ব্রহ্ম" এবং "রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ, সর্ব্বরসঃ" বলিয়াছেন। আনন্দ-শব্দে এবং রস-শব্দেও মাধুর্য্যই সূচিত হইয়া

থাকে ; সুতরাং মাধুর্য্যই যে পরব্রহ্মত্বের সার বা প্রাণবস্তু, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পরব্রহ্ম যে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ং-ভগবান্, তাহাতেও সন্দেহ নাই। "ওঁ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে এবং "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" ইত্যাদি গীতাবাক্যে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন— "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" সুতরাং মাধুর্য্য যে ভগবত্তার এবং পরব্রহ্মত্বের এবং পরতত্ত্বত্বেরও সার, তাহাও জানা যায়। সুতরাং যে স্থলে মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, সে স্থলে যে স্বয়ংভগবত্তার এবং পরতত্ত্বত্বেরও সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণে —"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে"—মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ বলিয়াই বলা হইয়াছে—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

যাহাহউক, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত স্বরূপ, রায়রামানন্দ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদরূপগোস্বামীর একটী বাক্য হইতে মনে হয়, তিনিও এই স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

—যিনি কৌতুহল-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রণয়িজনবৃন্দের (ব্রজবনিতা-গণের) মধ্যে কোনও এক জনের (শ্রীরাধার) অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার (শ্রীরাধার) কান্তি প্রকটিত করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে আবৃত

করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কৃপা করুন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে অপর কেহ কেহ যে এই "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপের" অনুভব পায়েন নাই, তাহাও বলা যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর এই রূপের অনুভব পাইয়াই "তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্"—বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

রায়রামানন্দ প্রভুর যে স্বরূপের দর্শন পাইয়াছেন, তাহা যে "রাধাদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ," পরিষ্কার ভাবেই তাহা বুঝা যায়। আর, তাহা যে "রাধাভাব-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপও", প্রভুর নিজের উক্তিতেই তাহা জানা যায়।

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥

—শ্রীচৈ, চ, ২৷৮৷২৩৯

রাধাভাব-সুবলিতত্ব

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্ব-প্রাপ্তিতেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার কান্তি-গ্রহণ যেমন সূচিত হইতেছে, তেমনি ভাবগ্রহণও সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণই মুখ্যরূপে আবশ্যক ; এই ভাবগ্রহণের জন্যই শ্রীরাধার সহিত তাঁহার একত্ব-প্রাপ্তি

এবং একত্ব-প্রাপ্তির ফলেই কান্তিগ্রহণ। "তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥"-বাক্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই যে শ্রীরাধার ভাবগ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাতেই বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করাতে সেই ভাবের আবেশে গৌরকৃষ্ণ নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রাণকান্ত মনে করেন, রাধাভাবাবিষ্ট গৌর-কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তদ্রূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন।

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় "রাধা"-জ্ঞান।

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।১৩

গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।১৭।২৭০

শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অন্তঃকরণ শ্রীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড়ভাবে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়াছে যে, প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হয়, শ্রীরাধার ভাবই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রভুর অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীরাধার অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে যে ভাব উদিত হয়, প্রভুর অন্তঃকরণেও সেই-সেই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার যে অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের স্ফূর্ত্তিতে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও সেইরূপ সুখের উদয় হইয়া থাকে; আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহে শ্রীরাধার চিত্তে যে তীব্র দুঃখের উদয় হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের ভাবে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও তদ্রূপ অসহ্য দুঃখ উদিত হইয়া থাকে।

রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৯৩

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবের দর্শনে শ্রীরাধার যেরূপ দিব্যোন্মাদ প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ভাবের আবেশে প্রভুও তদ্রূপ দিব্যোন্মাদ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

শেষ-লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৯৪-৯৫

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর আচরণের কথা উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও অপূর্ণ বাসনা



কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।১৭।১৩০-৩২

(১) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ন্যায় তাঁহার নাম, গুণ এবং লীলাসমূহও চিদানন্দ, সুতরাং পরম-মধুর, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। শ্রীশুকদেব-গোস্বামী প্রথমে ব্রহ্মানন্দ-রসে তন্ময় ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণলীলারসে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চিত্তও ব্রহ্মানন্দ হইতে সরিয়া আসিয়াছে, আর ফিরিয়া যায় নাই। "স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্। ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিল-বৃজিনঘ্নং ব্যাসসুনুং নতোঽস্মি॥ শ্রীভা, ১২।১২।৬৯॥—শ্রীসূত গোস্বামী বলিতেছেন—যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং তজ্জন্য যিনি অন্য সমস্ত বিষয়ে মনোব্যাপার-শূন্য (অন্য সমস্ত বিষয় হইতে স্বীয় মনোবৃত্তিকে দূরে রাখিতে সমর্থ) হইয়াও অজিত শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া কৃপাবশতঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকাশক শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণ জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, অখিল-পাপ-নাশক সেই ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করি।" শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহও এমনি মধুর, এমনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক যে, আত্মারাম মুনিগণও সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥—শ্রীভা, ১।৭।১০॥" শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি যে কেবল অপরেরই চিত্তাকর্ষক, তাহা নহে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক। ভগবান্‌ই নারদের নিকটে বলিয়াছেন—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥—নারদ! আমার ভক্তগণ যেস্থানে (আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কথা) কীর্ত্তন করেন, আমি সেই স্থানেই থাকি; তখন আমি বৈকুণ্ঠেও থাকিনা, যোগীদের হৃদয়েও থাকিনা।" নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই ভগবান্ কীর্ত্তন-স্থলে উপস্থিত হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার রূপ-মাধুর্য্যের ন্যায় তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদিও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক।

প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য যেমন আস্বাদন করা যায় না, তদ্রূপ তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদিও আস্বাদন করা যায় না। শ্রীরাধা এই সমস্তই পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন; যেহেতু, তাঁহার মধ্যে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহার অঙ্গে তাহার লহরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণও তৎসমস্ত আস্বাদনের জন্য লুব্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু ব্রজে তিনি স্ববিষয়ক প্রেমের আশ্রয় নহেন বলিয়া তাহা আস্বাদন করিতে পারেন না; প্রেমের বিষয়রূপে যতটুকু আস্বাদন সম্ভব, কেবলমাত্র ততটুকুই আস্বাদন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি-সুবলিত-রূপেই তিনি তাহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং **শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি সমস্তের মাধুর্য্যের আস্বাদনই বুঝায়।** রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু তৎসমস্তই আস্বাদন করিয়াছেন।

(২) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনাই ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের গৌর-রূপের হেতু। মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আরও দুইটী আনুষঙ্গিক বাসনার উদয় হয়—যে প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই প্রেমের মহিমা কিরূপ, তাহা জানিবার বাসনা এবং সেই প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই সুখটীই বা কিরূপ, তাহা জানিবার বাসনা। এইরূপে দেখা গেল, ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাব-কান্তি নিয়া গৌর হওয়ার হেতু হইল তিনটী বাসনা—একটী মুখ্য, আর দুইটী আনুষঙ্গিক। শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরও একথাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা-
নয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা দীয়ঃ॥

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিনটী বিষয়ে লোভবশতঃই শ্রীরাধার ভাবাঢ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ব্রজলীলায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের এই তিনটী বাসনা নিত্যই অপূর্ণ থাকে; যেহেতু, এই তিনটীর কোনও একটী বাসনাই শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় না হইলে পূর্ণ হইতে পারে না এবং ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় নহেন। রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণরূপেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটী বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দররূপে তিনি কিভাবে এই তিনটী অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, কিরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

মাধুর্য্যাস্বাদন ও অপূর্ণ বাসনার পূরণ

শ্রীরাধার ভাবের আবেশে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া প্রভু নীলাচলে যে সমস্ত বাক্য-চেষ্টাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ-স্বরূপদামোদর ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাসগোস্বামী সে-সমস্ত প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহাদের কড়চায় এবং স্তবাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্তবাদি

এবং কড়চা দেখিয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শী দাসগোস্বামীর মুখে শুনিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সে-সমস্ত বর্ণন করিয়াছেন। দিগ্‌দর্শনরূপে এই বর্ণনা হইতে এস্থলে কিছু কিছু উল্লিখিত হইতেছে।

নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণনাম আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—

সই! কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
ঐ নাম কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সখি তারে॥

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুও ঐ ভাবে নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়াছেন। পথে চলিতেছেন, আর অশ্রুবিগলিতনেত্রে প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিতেছেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

কৃষ্ণবিরহ-খিন্না শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভু অস্থির। হঠাৎ নামের স্ফূর্ত্তি হইল, নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদনে হর্ষভরে প্রভু বলিয়া ফেলিলেন—

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

—শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে হৃদয়ে আনন্দের সমুদ্র বর্দ্ধিত—তরঙ্গায়িত, উচ্ছ্বসিত—হইয়া উঠে; নাম-সঙ্কীর্ত্তনে নামের প্রতি পদে, এমন কি প্রতি অক্ষরেও, পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন পাওয়া যায় এবং সমস্ত দেহ-মন—দেহের প্রতি অণু-পরমাণু—যেন স্নাপিত হইয়া যায়, পরম-স্নিগ্ধতা লাভ করে। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউক।

রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত গৌড়ীয়-ভক্তগণ নীলাচলে গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে প্রভু নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাহ্য-স্মৃতি নাই। তৃতীয় প্রহরেও তাঁহার আবেশ স্তিমিত হয় নাই। গায়ক-বাদকগণ শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের আর কীর্ত্তন চালাইবার শক্তি নাই; প্রভু কিন্তু পূর্ণোদ্যমে নৃত্যকীর্ত্তনে বিভোর। শ্রীনিত্যানন্দাদি কৌশলে কীর্ত্তন বন্ধ করাইলেন।

রূপ-মাধুর্য্যের আস্বাদন। কৃষ্ণদর্শনের জন্য লুব্ধা হইয়া শ্রীরাধা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি বর্ণন করিয়া সখীদের নিকটে প্রলাপ করিতেন, রাধা-ভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ করিতেন।

শারদীয়-মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে গোপীদিগের চিত্তে যেই ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই ভাবের আবেশে প্রভু সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক উপবনে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতি তরুলতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতেছিলেন। প্রভু উপবনকে বৃন্দাবন এবং সমুদ্রকে যমুনা মনে করিয়াছেন। হঠাৎ দেখেন—এক কদম্ববৃক্ষের তলদেশে দাঁড়াইয়া আছেন—“কোটি-মন্মথমোহন মুরলীবদন। অপার সৌন্দর্য্যে হরে

জগন্নেত্র-মন ॥” দেখিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক-বিকার। “অন্তরে আনন্দ আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥” এমন সময় প্রভুর সঙ্গী স্বরূপ-দামোদরাদি প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল না। অর্দ্ধ-বাহ্য। “উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করে দরশন ॥” যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন। আর মুখে বলিলেন—“কাঁহা গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল নেত্র-মন ॥ পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন। তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥” এইরূপ অবস্থাতে প্রভুর মুখ হইতে নিম্নলিখিত প্রলাপোক্তি স্ফুরিত হইয়াছিল।

নবঘন-স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ, হরে সভার নেত্রমন,
কৃষ্ণকান্তি পরম-প্রবল ॥
কহ সখি! কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে মৌরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্র চন্দ্রের যাহাতে উদয় ॥

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্জা-পবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল॥
—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৫।৫৬—৬০

শ্রীকৃষ্ণ একবার দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হওয়াতে যেন অতৃপ্ত বাসনা-বশতঃ একটু ক্ষুব্ধ হইয়াই প্রভু আরও বলিলেন—

কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফাঁদ
তাতে অধর-মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর-দ্বার॥
বান্ধব! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগীমর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সভার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সভার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজ-যুগল,
ভুজ নহে—কৃষ্ণসর্পকায়।

দুই শৈলছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষ-জ্বালায় ॥
কৃষ্ণ-করপদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিতি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
এক বার যারে স্পর্শে, স্মর-জ্বালা বিশ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীর মন ॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৫।৬২-৬৭

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়ার পরে, তাঁহার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীরাধা স্বীয় সখী বিশাখার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের কথা যেভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার সেই ভাবের আবেশে প্রভুও রায়রামানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন—

ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগত উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে,
ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥
সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥
কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।

পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম-তনু ॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা ।
নারীর মন পৈশে হায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥

জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
সেই কান্তি জগত মাতায় ।
শৃঙ্গার-রস ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্নাসানি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥

কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্র-গর্জ্জন জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার ।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥

মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি ! মোর তেঁহো সুহৃত্তম ।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৯।৩৪-৪১

কৃষ্ণগুণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন। এক দিন প্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি সাক্ষাৎ মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপেই জগন্নাথকে দেখিলেন, জগন্নাথ-বিগ্রহের স্বরূপ দেখিতে পাইলেন না। জগন্নাথকে মুরলীবদন কৃষ্ণরূপে দেখা মাত্রই—

একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণে টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৫।৭-৮

শ্রীকৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটী গুণকে আস্বাদন করিবার জন্য প্রভুর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়েরই যুগপৎ উৎকণ্ঠাময়ী লালসা জাগিল। তখন লালসার তাড়নায় অধীর হইয়া ভাবাবেশে প্রভু প্রলাপোক্তিতে বলিলেন—

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ— সৌরভ্য অধর রস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভি পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিগে ধায় ॥
সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুপণ,
সভে করে হরে পরধন ॥
এক অশ্ব এক ক্ষণে, পাঁচে পাঁচ দিগে টানে,
এক মন কোন্ দিকে যায়।
এক কালে সভে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সভার কাহাঁ দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল পাঁচের পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥

কৃষ্ণরূপামৃত-সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
এক বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানারস-নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কহন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দুচন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যভর, মৃগমদ-মদ-হর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগত-নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
ছাড়ায় অন্যত্র লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৫।১৩-২১

লীলামাধুর্য্যের আস্বাদন।

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখেন স্বপন॥

ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
"বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইলুঁ" এই জ্ঞান হৈলা॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে "স্বপ্ন"-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা॥
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।১৫-২০

তখনও প্রভুর আবেশ ছুটে নাই ; তিনি—

জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

তিনি সুভদ্রা-বলরামকে দেখিতে পাইতেছেন না ; কেবল জগন্নাথকেই দেখিতে পাইতেছেন—তাহাও ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে। কতক্ষণ পরে কোনও কারণে প্রভুর একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল ; তখন তিনি সুভদ্রা এবং বলরামকেও দেখিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুভদ্রা ও বলরাম তো ব্রজে থাকেন না ; শ্রীরাধা সুভদ্রা ও বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রেই দেখিয়াছিলেন। তখন শ্রীরাধার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, সুভদ্রা-বলরামকে দেখিয়া প্রভুর মনও সেই ভাবে আবিষ্ট হইল ; তিনি মনে করিলেন—কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন।

কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাঁহা বৃন্দাবন॥

তিনি ভাবিলেন—"এই কি হইল। এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনেই ছিলাম। এক্ষণে হঠাৎ কুরুক্ষেত্রে কেন? কোথা হইতে

কুরুক্ষেত্র আসিল ? কিরূপেই বা আমি এখানে আসিলাম ? বৃন্দাবন কোথায় গেল ?" তখন—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা ।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা ॥
ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লেখে ।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে ॥
"পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলুঁ ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুই আইলুঁ ॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩৷১৪৷৩৩-৩৫

তখনও প্রভুর আবেশ ছুটে নাই। সমস্ত দিন এই ভাবে কাটিয়াছে। রাত্রিকালে স্বরূপদামোদর এবং রামানন্দের নিকটে মনের দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

আর এক দিন প্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতেছেন; সঙ্গে গোবিন্দ। পথে চটক-পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন।

প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি ।
স্তম্ভভাব পথে হৈল—চলিতে নাহি শক্তি ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার ।
তার উপরে রোমোদ্‌গম কদম্ব-প্রকার ॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ।
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার ॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার ।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গাযমুনা-ধার ॥

বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।৮৫-৯০

গোবিন্দ জলসেচন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। শুনিয়া স্বরূপদামোদরাদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। তখন "হরিবোল" বলিয়া প্রভু আচম্বিতে উঠিয়া বসিলেন ; কিন্তু বাহ্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই।

উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চাহে, তাহা দেখিতে না পায় ॥

লোকজন দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল। তখন বলিলেন—

গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেলুঁ গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি! বর্ণিতে না জানি ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহাঁ হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা ॥

কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।৯৯-১০৬

ভাবাবেশে প্রভু রাসান্তে জলকেলি-লীলাও দর্শন করিয়াছিলেন।

লীলাগ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, শ্রীরাধাও কোনও কোনও সময় নিজেকে ললিতা এবং ললিতাকে শ্রীরাধা মনে করিতেন এবং তদ্রূপ ব্যবহারও করিতেন। ইহাকে পারিভাষিক ভাষায় দিব্যোন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা বলে। উদ্‌ঘূর্ণাবশতঃই রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু উল্লিখিত প্রলাপ-বাক্যাদিতে নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করেন নাই। তখনও যে তাঁহার মধ্যে শ্রীরাধারই ভাব, তাঁহার অঙ্গের সাত্ত্বিক-বিকারাদিই তাহার প্রমাণ। প্রেমাবেশে সাত্ত্বিক বিকার শ্রীরাধাব্যতীত অপরেরও হয়; কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক প্রায়শঃ দেখা যায় না। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

যাহা হউক, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে কিরূপ সুখ পাওয়া যায়, মাধুর্য্য আস্বাদনের দ্বারা তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন। এইরূপে তিনি ব্রজলীলার তিনটী অপূর্ণ বাসনার মধ্যে দুইটী পূর্ণ করিয়াছেন।

(গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এস্থলে প্রলাপোক্তিগুলির বিবৃতি দেওয়া হইল না। যাঁহারা তাহা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা দেখিতে পারেন।)

শ্রীরাধার প্রেমমহিমা জানিবার বাসনা কিরূপে তিনি পূর্ণ করিলেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা হইতেছে।

———

শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার আস্বাদন

(১)

রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের এক মহিমা-বৈচিত্রী প্রকাশ করাইয়াছেন। রায়রামানন্দ বলিলেন—দাস্যপ্রেম অপেক্ষা সখ্যপ্রেমের, সখ্য-প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য-প্রেমের এবং বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা কান্তা-প্রেমের মহিমা অত্যধিক। কান্তাপ্রেমের মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বাতিশায়ী। ব্রজগোপীগণের সকলের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপরিশোধ্য প্রেমঋণে ঋণিত্বের কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—"ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" বাক্যে; কিন্তু শ্রীরাধার নিকটে তাঁহার প্রেমবশ্যতা সর্ব্বাধিক। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়; তথাপি তিনি যে শ্রীরাধার প্রেমবশ্যতায়, শ্রীরাধার প্রেমরূপ বাজিকরের হাতে যেন পুতুলের মত নৃত্য করিতে থাকেন—ইহাতেই শ্রীরাধাপ্রেমের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। রায়রামানন্দ আরও জানাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের রস-স্বরূপত্বের এবং তাঁহার মদন-মোহনত্বের হেতুও শ্রীরাধার প্রেম। শ্রীরাধার প্রেম অন্য-নিরপেক্ষ। স্বীয় প্রেম-প্রভাবে শ্রীরাধাই হইতেছেন রাসেশ্বরী; রাসস্থলীতে শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে, অপর শতকোটি গোপীর উপস্থিতিতেও পরম-রস-কদম্বময়ী রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এমন কি রাসলীলার বাসনাও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব এবং উভয়ের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত—যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে রাধাকৃষ্ণের পরৈক্য-

প্রাপ্তি। রামানন্দের মুখে এ-সকল কথা শুনিয়া প্রভু বলিয়াছিলেন—"রাধাপ্রেম সাধ্য-শিরোমণি।" প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াই রাধাপ্রেমের এই বৈশিষ্ট্যের কথা শুনিয়াছিলেন এবং পরমানন্দও অনুভব করিয়াছিলেন এবং রামানন্দকে বলিয়াছিলেনও—"অপূর্ব্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে।"

এই ভাবে রাধাপ্রেমের এক মহিমা-বৈচিত্রী প্রভু আস্বাদন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা আনন্দদায়ক হইলেও তাত্ত্বিক-মহিমা। প্রভুর চিত্তে আনন্দ জন্মাইয়া এই তাত্ত্বিক মহিমা এক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিলেও ইহাই রাধাপ্রেমের একমাত্র মহিমা নহে। প্রভুর চিত্ত ও দেহের উপরে রাধাপ্রেমের কি অপূর্ব্ব প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

(২)

প্রেমের মহিমা দুই রকমে অভিব্যক্ত হইতে পারে—আস্বাদন-মাধুর্য্যে এবং দেহের উপরে তাহার প্রভাবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রেম হইতেছে, হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি; সুতরাং স্বতঃই ইহা মধুর, আস্বাদ্য। প্রেম যতই গাঢ় হইতে থাকে, ইহার আস্বাদ্যত্ব, মাধুর্য্য, ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেম হইতেছে প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা—অনুরাগোৎকর্ষের চরমতম বিকাশ; সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের মাধুর্য্যও সর্ব্বাতিশায়ী। প্রেম যখন গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে মহাভাব-স্তরে উন্নীত হয়, তখন তাহা এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ধারণ করে; ইহা স্বর্গের অমৃত অপেক্ষাও কোটি কোটিগুণে অধিক মধুর; বোধহয় স্বর্গের অমৃতও মহাভাবের মাধুর্য্যকে বরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়। এতাদৃশ যে মাধুর্য্য, তাহাই হইতেছে মহাভাবের স্বরূপগত-সম্পত্তি। তাই উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে মহাভাবকে

বলা হইয়াছে—বরামৃত-স্বরূপশ্রী। এতাদৃশ মহাভাবেরই গাঢ়তম অবস্থা হইল শ্রীরাধিকার মাদনাখ্য প্রেম। সুতরাং মাদনের মাধুর্য্য যে সর্ব্বাতিশায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—হ্লাদিনী বলিতে হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝায়; তাহার মধ্যে হ্লাদিনী যেমন আছে, সংবিৎও তেমনি আছে; অবশ্য হ্লাদিনীরই প্রাধান্য। এই হ্লাদিনী-অংশেই প্রেম মধুর; সংবিৎ-অংশদ্বারা অনুভব হয়।

রাধাপ্রেমের মাধুর্য্যাতিশয়রূপ মহিমার অনুভব

মাদন যেই অনুরাগোৎকর্ষের চরমতম বিকাশ, তাহার তিনটী স্বরূপ—ভাব, করণও কর্ম্ম। ভাব-স্বরূপে এই অনুরাগোৎকর্ষ হইতেছে—আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। অনুরাগের উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি অনুভূত হয়, তখন মাধুর্য্যাদির আস্বাদনাধিক্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিজের স্মৃতিও থাকেনা, আস্বাদ্য মাধুর্য্যাদির স্মৃতিও থাকেনা, থাকে কেবল আস্বাদনের বা অনুভবের জ্ঞান। এই অবস্থায় অনুরাগোৎকর্ষই যেন একমাত্র অনুভবে বা একমাত্র অনুভবের আনন্দে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই অনুরাগোৎকর্ষের ভাব-স্বরূপ। তারপর, করণ-স্বরূপ। করণ অর্থ—উপায়, যদ্দ্বারা বা যাহার সহায়তায় কোনও কাজ করা যায়, তাহাই সেই কার্য্যের করণ; যেমন, লাঠিদ্বারা কাহাকেও আঘাত করা; এই স্থলে লাঠি হইল আঘাতের করণ। সংবিদংশে অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা হয়। "প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৪৪॥" সুতরাং অনুরাগোৎকর্ষ হইল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের করণ। এই অনুরাগ যখন সর্ব্বোৎকর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদিও সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হয় করণ। সর্ব্বশেষে কর্ম্মস্বরূপ—যাহা করা যায়, তাহা কর্ম্ম। যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহা হইল আস্বাদনের কর্ম্ম। অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা যায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের দ্বারাও অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥ ১।৪।১৫৭—৫৮॥" গোপিকাদিগের এই যে আনন্দ, তাহাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের প্রভাবে, স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে তাঁহাদের হৃদয়স্থিত প্রেম বা অনুরাগোৎকর্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; এই উচ্ছ্বসিত অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবেই এই আনন্দ—অনুরাগোৎকর্ষের হ্লাদিনী-অংশের অনুভবজনিত আনন্দ। অনুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের প্রভাবেও অনুরাগোৎকর্ষ অসমোর্দ্ধরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণের কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। "মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। অন্যোন্যে বাঢ়য়ে কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১২৪॥" এইভাবে, মাদনের অনুভব-জনিত যে আনন্দ, তাহাও সর্ব্বাতিশায়ী। রাধা-ভাবাবিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের উপলক্ষ্যে রাধাপ্রেম মাদনের

আস্বাদন-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া **রাধাপ্রেমের মাধুর্য্যাতিশয়রূপ মহিমাবৈচিত্রীর উপলব্ধি পাইয়াছেন।**

প্রভুর দেহের উপরে রাধাপ্রেমের প্রভাব। এক দিন রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরাদি পরে তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে তাঁহাকে পাইলেন। প্রভু ভূমিতে পড়িয়া আছেন; তাঁহার দেহের অবস্থা অদ্ভুত।

প্রভুর পড়িয়াছে দীর্ঘ—হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্তপদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তাত'॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।৬০—৬৪

স্বরূপদামোদর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভুর কাণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম বলাতে প্রভুর চেতনা ফিরিয়া আসিল; তখনই তাঁহার দেহের স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরিয়া আসিল। তখন নিজেকে সিংহদ্বারে দেখিয়া প্রভুর বিস্ময় জন্মিল এবং স্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহাঁ কর কি।" তিনি বলিলেন—"প্রভু ঘরে চল; সেখানে সব কথা

বলিব।” প্রভুকে লইয়া তাঁহারা গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রভুর অবস্থা সমস্ত তাঁহাকে জানাইলেন। তখন—

প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান্।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া করে অন্তর্দ্ধান ॥
—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।৭২-৭৩

আর একদিন, যমুনাতে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি-লীলা-দর্শনের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন—উজ্জ্বল-জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে। সঙ্গের লোকেরা কেহই টের পায়েন নাই। সমস্ত রাত্রি তাঁহারা প্রভুর অনুসন্ধান করিলেন। সমুদ্রে পতিত হওয়ামাত্রই প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সমুদ্রের তরঙ্গে কখনও ভাসিতেছেন, কখনও ডুবিতেছেন। তরঙ্গ তাঁহাকে কোণার্কের দিকে লইয়া গেল। “যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ করে—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥” হঠাৎ এক জালিয়ার জালে তিনি আট্‌কা পড়িলেন। বড় মাছ মনে করিয়া জালিয়া তাঁহাকে জালসহ টানিয়া তুলিল। জাল ছাড়াইবার সময় প্রভুর স্পর্শে জালিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া গেল—হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, আর “হরি হরি” বলে। জালিয়া মনে করিল, তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। প্রভুকে সমুদ্রতীরে বালির উপরে রাখিয়া জালিয়া ওঝার নিকটে যাইতেছিল; পথে প্রভুর অন্বেষণে রত স্বরূপাদির সঙ্গে দেখা হইল। জালিয়ার অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া স্বরূপদামোদর তাহাকে ধরিলেন। তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। জালিয়া প্রভুকে চিনিতে পারে নাই, মনে করিয়াছে এক অদ্ভুত মৃতদেহ।

শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ সাত।
একেক হাথ পাদ তার তিন তিন হাথ ॥
অস্থিসন্ধি ছুটিল, চাম করে নড়বড়ে।
তাহারে দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে ॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু "গোঁ গোঁ" করে, কভু অচেতন ॥

—চৈ, চ, ৩।১৮।৪৯-৫১

স্বরূপাদি বুঝিলেন—ইনি প্রভুই। জালিয়াকে শান্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া তাঁহারা প্রভুর নিকটে গেলেন ; গিয়া দেখিলেন—

ভূমি পড়ি আছে প্রভু, দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেততনু, বালু লাগিয়াছে গায় ॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু, চর্ম্ম নটকায়।

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৮।৬৮-৯

সময়োচিত সেবাদির অন্তে স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করাতে কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, শরীরও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

এই ত গেল প্রভুর দীর্ঘাকৃতি ধারণের কথা। কখনও কখনও বা প্রভু কূর্ম্মাকৃতিও ধারণ করিতেন।

একদিন রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রভু গম্ভীরা হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদরাদি তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে জগন্নাথের সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিকে তেলেঙ্গা-গাভীগণের মধ্যে প্রভুকে পাইলেন। প্রভুর দেহের অদ্ভুত অবস্থা।

পেটের ভিতর হস্ত-পদ—কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥

অচেতন পড়ি আছে, যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল॥
গাভী সব চৌদিগে শুঙ্খে প্রভু-অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অনেক ক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥
চেতন পাইলে হস্ত পদ বাহিরাইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৭।১৫-২০

তখন—

উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি-উতি।
স্বরূপে কহে—"তুমি আমা আনিলে কতি॥
বেণু-শব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ-সহ বিহার হাস-পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৭।২১-২৬

রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর দেহের দীর্ঘাকৃতি এবং কূর্ম্মাকৃতি, তাঁহার দেহের উপরে, চিত্তস্থিত রাধাভাবের এক অপূর্ব্ব প্রভাবের পরিচায়ক। সমুদ্রে যখন প্রবল বন্যা উত্থিত হয়, তখন তাহা সমুদ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট নদ-নদীকেও উচ্ছ্বসিত করিয়া তীরভূমিকেও প্লাবিত করিয়া ধাবিত হইতে থাকে; গতিপথে যে সকল বিরাট বৃক্ষাদি তাহার গতিতে বাধা জন্মাইতে থাকে, তাহাদিগকেও ছিন্নমূল করিয়া স্রোতের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে থাকে। সেই বন্যা আবার যখন সমুদ্রাভিমুখী হয়, তখন উৎপাটিত বৃক্ষাদিকেও সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। প্রভুর হৃদয়স্থিত শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবেরও যেন সেই অবস্থা। এই প্রেমসমুদ্র প্রভুর হৃদয়ে আছে; আবার স্বীয়রসে প্রভুর দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকেও পরিসিক্ত করিয়া থাকে। একথা রামানন্দরায়ের নিকটে প্রভুই বলিয়াছেন। "তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥" সমুদ্রের সহিত তৎসংশ্লিষ্ট নদ-নদীর ন্যায়, প্রভুর চিত্তস্থিত প্রেম-সমুদ্রের সহিতও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অবস্থিত প্রেমরস সংশ্লিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কোনও ব্যাপারের স্ফুরণে প্রভুর চিত্তস্থিত প্রেমসমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইয়া বন্যার আকার ধারণ করে, তখন তাহার প্রভাবে প্রভুর সর্ব্বাঙ্গস্থিত প্রেমরসও উচ্ছ্বসিত হইয়া বন্যার সঙ্গে মিলিত হয়, বাহিরের দিকে ধাবিত হইতে থাকে; তাহারই গতিবেগে প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপ বৃক্ষাদির অস্থি-গ্রন্থিরূপ মূল যেন ছিন্ন হইয়া যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বন্যার গতিমুখে চালিত হইতে থাকে, শিথিলীকৃত চর্ম্মের বন্ধনে মাত্র দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। তাহাতেই প্রভুর দেহ অদ্ভুতরূপে দীর্ঘাকৃতি ধারণ করে। কোনও কারণে প্রেমবন্যা যখন আবার হৃদয়ের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, অথবা হৃদয়স্থিত প্রেমসমুদ্র যখন দেহস্থিত প্রেমরসকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে

থাকে—তখন তাহার গতিবেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও ভিতরের দিকে ঢুকিতে থাকে। তখনই প্রভুর দেহ অদ্‌ভুত কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে।

প্রভু স্বয়ংভগবান্‌, সর্ব্বশক্তিমান্‌। কিন্তু রাধাপ্রেমের উদ্দাম প্রভাবকে বাধা দেওয়ার সামর্থ্য তাঁহারও নাই। প্রভুর দেহের উপরি-ভাগে, প্রভুর শ্যাম-দেহকে আবৃত করিয়া, যেন রক্ষাকবচরূপেই আছে শ্রীরাধার গৌর দেহ। প্রভুর অস্থি-গ্রন্থির চর্ম্মাবরণ যখন শিথিল বা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখন তত্তৎ-স্থানের শ্রীরাধার দেহও নিশ্চয়ই শিথিল বা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মাদন-ঘন-বিগ্রহা মাদনের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধাও কি স্বীয় প্রেমের প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থা ?

ব্রজলীলায় স্বীয় চিত্তস্থিত মাদন-প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধার দেহের দীর্ঘাকৃতি বা কূর্ম্মাকৃতি ধারণের কথা শুনা যায় না। কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"লোকে নাহি দেখি ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি। হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিশিরোমণি ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১৪।৭৬ ॥" ইহাতে বুঝা যায়, ব্রজলীলায় শ্রীরাধা স্বীয় প্রেমের প্রভাব সম্বরণ করিতে পারেন। মাদনের প্রভাব সম্বরণ করার সামর্থ্য তাঁহার আছে। তথাপি, তাঁহার প্রেমের প্রভাব কি অদ্‌ভুত, তাহা জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের একটী অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীরাধা গৌরলীলায় তাঁহার সেই সামর্থ্যকে প্রকটিত করেন না—করিলে, প্রভুর দেহ দীর্ঘাকার বা কূর্ম্মাকার ধারণ করিত না, প্রেমের এই অদ্ভুত প্রভাবও তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত। অথবা, ইহাও হইতে পারে, গৌরলীলায় মাদনাখ্য-মহাভাব যে অপূর্ব্ব উদ্দামতা লাভ করিয়াছে, ব্রজলীলায় তদ্রূপ হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে ইহার কারণ বোধ হয়—গৌর-লীলায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত বলবতী উৎকণ্ঠা ; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের

জন্য গৌর-কৃষ্ণের বলবতী উৎকণ্ঠা ; আর সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া প্রাণবল্লভের বাসনা-পূরণের জন্য শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা। এই উভয়ের সম্মিলিত উৎকণ্ঠার ফলে প্রভুর হৃদয়স্থিত প্রেম এমনই উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে যে, স্বয়ং শ্রীরাধাও তাহার প্রভাব সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে স্বীয় দেহের উপরে রাধাপ্রেমের এক অদ্ভুত অসম্বরণীয় প্রভাব অনুভব করিয়া প্রভু রাধাপ্রেম-মহিমার অপর এক বৈচিত্রীর উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন।

এইভাবে প্রভু রাধাপ্রেম-মহিমার আস্বাদন করিয়া তাঁহার আর একটী অপূর্ণ বাসনার পূরণ করিয়াছেন।

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব ও প্রভুর রাধাস্বরূপত্ব

সাত্ত্বিক ভাব বলিতে প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে জাত ভাবকে বুঝায় না। সাত্ত্বিক ভাব হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ এবং যে সত্ত্ব-শব্দ হইতে এস্থলে সাত্ত্বিক-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই সত্ত্বও একটী পারিভাষিক (বিশেষ-অর্থদ্যোতক) শব্দ।

সত্ত্ব—"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্‌বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥ ২।৩।১॥—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ সত্ত্ব বলেন ; কৃষ্ণের সহিত এই সম্বন্ধ সাক্ষাদ্‌ভাবেও হইতে পারে, কিঞ্চিৎ ব্যবধানবশতঃও হইতে পারে।" এইরূপে দেখা গেল—সত্ত্ব-শব্দে একটা বিশেষ অবস্থাপন্ন চিত্তকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধবশতঃ

ভক্তের চিত্তে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়, সেই সমস্ত ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলেই চিত্তের ঐরূপ বিশেষ অবস্থা জন্মে।

সাত্ত্বিক-ভাব—"সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ২।৩।২॥—এইরূপ সত্ত্ব হইতে (উক্তরূপ বিশেষ অবস্থাপন্ন চিত্ত হইতে) যে সমস্ত ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক ভাব বলে।

চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের বা কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ জন্মিতে পারে, অন্যথা নহে। সুতরাং জাতপ্রেম বা জাতরতি ভক্তের চিত্তই কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। এই সমস্ত ভাবও প্রেম হইতেই উদ্ভূত। প্রেম হইতেই উদ্ভূত এই সমস্ত ভাবের দ্বারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন বাহিরে অর্থাৎ ভক্তের দেহেও কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণগুলিকে বলে **অনুভাব**। এই অনুভাবের দ্বারাই চিত্তস্থিত ভাবের অস্তিত্ব জানা যায়। "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ ॥ ভ, র, সি, ২।২।১॥"

চিত্তস্থিত প্রেমের বা প্রেমজাত ভাবের যে সকল লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদের কয়েকটী এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে—নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লালাস্রাব, অট্টহাস, ইত্যাদি এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদি।

এই সমস্ত বহির্লক্ষণ আবার দুই জাতীয়। কতকগুলি লক্ষণ আছে, ভক্ত ইচ্ছা করিলে যে গুলিকে বাহিরে প্রকাশ না করিতেও পারেন; যেমন—নৃত্য, গীত, ভূমিতে বিলুণ্ঠন, উচ্চরব, হুঙ্কারাদি। নৃত্যগীতাদির ইচ্ছা ভিতরে জাগিতে পারে; কিন্তু ভক্ত ইচ্ছা করিলে নৃত্যগীতাদি না করিতেও পারেন। এজন্য এই গুলিকে বুদ্ধিমূলক অনুভাব বলে। আর কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত; এইগুলি যখন সম্যক্

বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন ভক্ত ইচ্ছা করিলেও এইগুলিকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন না ; যেমন—অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি।

এইরূপে দেখা গেল—সমস্ত বাহ্যবিকারই একই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের কতকগুলি হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি হইতে জাত, আর কতকগুলি স্বাভাবিক। "নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধি-পূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, স্তম্ভাদীনাং তু স্বত এব প্রবৃত্তিরিত্যস্য নৃত্যাদিষু ন ব্যাপ্তিঃ ॥—ইতি ভ, র, সি, ২।৩।২-শ্লোক টীকায় শ্রীজীব।"

এইরূপে দেখা গেল, বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি হইতে জাত বাহ্যবিকার এবং স্বাভাবিক বাহ্যবিকার—এই উভয়ই চিত্তস্থিত ভাবের পরিচায়ক বলিয়া উভয়েরই অনুভাবত্ব আছে। তথাপি দুই শ্রেণীর পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি হইতে জাত নৃত্য-গীত-বিলুণ্ঠনাদিকে বলা হয় উদ্‌ভাস্বর অনুভাব, কখনও কখনও বা কেবল অনুভাব। আর, অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি স্বাভাবিক বাহ্যবিকার সমূহকে বলা হয় সাত্ত্বিক ভাব।

সাত্ত্বিক ভাবসমূহের উদ্ভব-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—

চিত্তং সত্ত্বীভবৎপ্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্।
তদা স্তম্ভাদয়োভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।
তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ ॥
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।
চত্বারি ক্ষ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে।
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ ॥
স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুজলাশ্রয়ঃ।
তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ।

স্বস্তু এব ক্রমান্মন্দমধ্যতীব্রত্বভেদভাক্।
রোমাঞ্চকম্পবৈস্বর্য্যান্যত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ ॥
—ভ, র, সি, ২।৩।৭-৮

—চিত্ত যখন সত্ত্বস্থ-(কৃষ্ণসম্বন্ধীভাবসমূহদ্বারা আক্রান্তত্ব) প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চল মনকে প্রাণে সমর্পণ করে এবং প্রাণ বিকারাপন্ন হইয়া দেহকে অত্যধিকরূপে ক্ষুভিত করে, তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের উদয় হয়।

সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

কখনও কখনও প্রাণ—ক্ষিতি (পৃথিবী বা ভূমি), জল, তেজঃ এবং মরুৎ (আকাশ)—দেহস্থিত এই চারিটী মহাভূতকে অবলম্বন করে, আবার কখনও স্বপ্রধান হইয়া (অর্থাৎ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া) সর্ব্বতোভাবে দেহে বিচরণ করে।

প্রাণ যখন ক্ষিতিস্থিত হয়, তখন স্তম্ভ, যখন জলস্থিত হয়, তখন অশ্রু, যখন তেজঃস্থিত হয়, তখন স্বেদ (ঘর্ম্ম) এবং বৈবর্ণ্য, যখন মরুৎ (আকাশ)-স্থিত হয়, তখন প্রলয় (মূর্চ্ছা) বিস্তার করে ; আর, প্রাণ যখন বায়ুতেই স্থিত হয়, তখন যথাক্রমে মন্দ, মধ্য এবং তীব্রত্বাদি ভেদ প্রাপ্ত হইয়া রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ—এই তিনটীকে প্রকাশ করে।

এই সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব স্পষ্টরূপেই বাহ্যদেহের এবং অন্তরের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ অন্তরের ক্ষোভের বহির্বিকাশই হইল বাহ্যিক দেহের ক্ষোভ। অন্তরকে বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ করে বলিয়াই সাত্ত্বিক ভাব সাধারণতঃ অসম্বরণীয় হয়।

বলা বাহুল্য, অন্যান্য কারণেও লোকের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদি দেখিতে পাওয়া যায় ; কেহ কেহ বা অভ্যাসের দ্বারাও অশ্রু-কম্পাদি প্রকাশ

করাইয়া থাকে—যেমন অভিনেতারা। কিন্তু কেবল কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবের প্রভাবে উদ্ভূত অশ্রু-কম্পাদিই সাত্ত্বিকভাব, অন্যগুলি নহে।

যাহাহউক, চিত্তস্থিত প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে চিত্তের উপরে কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবসমূহের প্রভাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। তাহারই ফলে সাত্ত্বিক ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত এবং সূদ্দীপ্ত—এই পাঁচটী বৈচিত্রী ধারণ করে।

ধূমায়িত সাত্ত্বিক। যে সাত্ত্বিক স্বয়ং বা অপর কোনও সাত্ত্বিক ভাবের সহিত মিলিত হইয়া অল্পমাত্র অভিব্যক্ত হয় এবং যাহার বিকাশ গোপন করিতে পারা যায়, তাহার নাম ধূমায়িত।

জ্বলিত সাত্ত্বিক। দুইটী বা তিনটী সাত্ত্বিক ভাব যদি একই সময়ে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে গোপন করিতে হইলে যদি অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে জ্বলিত সাত্ত্বিক।

দীপ্ত সাত্ত্বিক। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিনটী, চারিটী বা পাঁচটী সাত্ত্বিক ভাব যদি একই সময়ে উদিত হয়, এবং তাহাদিগকে যদি কিছুতেই সম্বরণ করা না যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে দীপ্ত সাত্ত্বিক।

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক। একই সময়ে যদি পাঁচটী, বা ছয়টী, বা সমুদয় সাত্ত্বিক ভাব উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলা হয়।

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক। সু+উদ্দীপ্ত=সূদ্দীপ্ত। সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত। মহাভাবে সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ততার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে তাহাদিগকে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলে। "উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী। সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৭॥" শ্লোকস্থ "মহাভাবে"-শব্দ হইতে

জানা যাইতেছে—একমাত্র মহাভাবেই সাত্ত্বিক ভাবসকল সূদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে।

প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং মহাভাবে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণপরিকর ব্যতীত অন্যের মধ্যে স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের মধ্যেও কেবলমাত্র কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদের মধ্যেই মহা-ভাবের অস্তিত্ব, অন্যত্র নাই। উপরে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের যে লক্ষণের কথা বলা হইল, তাহা যে কেবল মহাভাববতী গোপসুন্দরীদের মধ্যেই সম্ভব, অন্যত্র সম্ভব নহে, তাহাও জানা গেল।

কিন্তু সমস্ত গোপসুন্দরীতেই যে সাত্ত্বিক ভাবসকল সূদ্দীপ্ত হয় না, একমাত্র শ্রীরাধাতেই যে তাহা সম্ভব, এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

মহাভাবও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে কয়েকটী স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। মহাভাবের দুইটী স্তর—রূঢ় এবং অধিরূঢ়। যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে বলে রূঢ়-মহাভাব। "উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব-প্রকরণে ১৪৪।" আর, যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব (লক্ষণ)-সকল হইতেও সাত্ত্বিকভাব-সকল কোনও এক অনির্ব্বচনীয়া বিশিষ্ট-দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বলে অধিরূঢ় মহাভাব। "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ় নিগদ্যতে॥ উ, নী, ম, স্থা, ১২৩॥" এস্থলে যে অনির্ব্বচনীয়া বিশিষ্ট-দশার কথা বলা হইল, তাহা সূদ্দীপ্ত-দশা নহে। "অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্ব্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ, ন তু সূদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ।—টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" ইহাতে বুঝা গেল, অধিরূঢ়-মহাভাবেও সাত্ত্বিকভাব সকল সূদ্দীপ্ত হয় না।

যাহাহউক, গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে অধিরূঢ়-মহাভাবও প্রথমে মোদন, তাহার পরে মাদনে পরিণত হয়। মোদনে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়েই উদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাবময় সৌষ্ঠব ধারণ করেন। "মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্ত-সৌষ্ঠবম্॥ উ, নী, স্থা, ১২৫॥" মোদনেও যে সাত্ত্বিকভাব-সকল সূদ্দীপ্ত হয় না, কেবল উদ্দীপ্ত মাত্র হয়, তাহাও জানা গেল। আর, হ্লাদিনীর সার প্রেম যদি রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবের উদ্‌গমে উল্লাসশীল হয়, তবে তাহাকে মাদন বলে। ইহা পরাৎপর, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেমস্তর-সমূহ হইতেও উৎকৃষ্ট। এই মাদন শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কাহাতেও দৃষ্ট হয় না। "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনী-সারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উ, নী, স্থা, ১৫৫॥"

এস্থলে যে মোদনের কথা বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অবস্থায় তাহাই মোহন-নামে খ্যাত হয় এবং বিরহ-বৈবশ্যবশতঃ মোহনেই সাত্ত্বিকভাব-সকল সূদ্দীপ্ত হয়। "মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহ-বৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥ উ, নী, স্থা, ১৩০॥" ইহা হইতে জানা গেল, কেবল মোহনেই সাত্ত্বিক ভাব-সকল সূদ্দীপ্ত হইতে পারে, মোদনেও সূদ্দীপ্ত হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্ব্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ ন তু সূদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥"

মোহনভাব আবার বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই প্রায়শঃ উদিত হয়, অন্য কোনও ব্রজসুন্দরীতে উদিত হয় না। "প্রায়ঃ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি॥ উঃ নী, স্থা, ১৩২॥"

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব যখন মোহনেরই বিশেষ লক্ষণ, আবার মোহন যখন শ্রীরাধিকাতেই উদিত হয়, তখন সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব যে শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা গেল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যদি সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বুঝা যাইবে যে, মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সম্বন্ধে বহু উক্তি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। এস্থলে কয়েকটীমাত্র উল্লিখিত হইতেছে।

নীলাচলে রথযাত্রাকালে রথের অগ্রভাগে প্রভু নৃত্য করিতেছেন। অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাব প্রভুর দেহে এক সঙ্গেই সূদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুলক বা রোমাঞ্চে রোমমূল ব্রণাকার ধারণ করিয়াছে, দেহ কণ্টকবেষ্টিত শিমূল বৃক্ষের মত হইয়াছে। কম্পে প্রতিটী দন্ত এত বেগে কাঁপিতেছে, মনে হয় যেন সমস্ত দন্ত খসিয়া পড়িতেছে। প্রস্বেদে, সমস্ত অঙ্গ হইতে এত তীব্রবেগে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে যে, ঘর্ম্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসিতেছে। স্বরভেদ এমনিই তীব্র যে, "জগন্নাথ" বলিতে যাইয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে কেবল "জজ গগ, জজ গগ" বলিতেছেন। অশ্রু যেন পিচকারীর ধারার ন্যায় তীব্রবেগে এবং প্রচুর পরিমাণে বহির্গত হইতেছে; প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন; চারিদিকের লোক সেই অশ্রুধারায় এমনভাবে ভিজিয়া যাইতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। বৈবর্ণ্যে, প্রভুর উজ্জ্বল স্বর্ণের মত কান্তি কখনও রক্তবর্ণ, কখনও বা মল্লিকাপুষ্পের মত সাদা হইয়া যাইতেছে। স্তম্ভে, কখনও বা প্রভু শুষ্ক-কাষ্ঠখণ্ডের মত ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছেন, হস্তপদ নিশ্চল। প্রলয়ে, ভূমিতে পড়িয়া থাকেন, শ্বাস-প্রশ্বাসহীন। আবার কখনও বা মুখ হইতে ফেন বহির্গত হইতেছে।

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥
মাংসব্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম।
"জজ গগ জজ গগ"—গদ্গদ্ বচন॥
জলযন্ত্রধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ককাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয়॥
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥
কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে পড়ে যেন॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।১৩।৯৬-১০৪

প্রভু যেদিন সর্ব্বপ্রথমে একাকী জগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন, সেদিন শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। দৈবাৎ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুর সৌন্দর্য্য এবং অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। অচেতন অবস্থায় প্রভু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া আছেন।

সার্ব্বভৌম নিজের লোকদ্বারা প্রভুকে বহন করাইয়া স্বগৃহে লইয়া আসিলেন, পবিত্রস্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। প্রভুর শ্বাস নাই, প্রশ্বাস নাই, উদর-স্পন্দন পর্য্যন্ত নাই। ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলেন। সূক্ষ্ম তুলা প্রভুর নাসিকার অগ্রভাগে ধরিয়া দেখিলেন—তুলা একটু একটু নড়িতেছে; তখন তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তখন শাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্য বিচার করিয়া স্থির করিলেন—এই অপূর্ব্বদর্শন নবীন-সন্ন্যাসীর দেহে—"সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই, নাম যে প্রলয়।"

বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই—নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব হয়॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৬।১০-১১

প্রভুর দেহে প্রকটিত সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকবিকারই নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার সহিত একত্ব প্রাপ্ত না হইলে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ সম্ভব নয় এবং ইহাও বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই শ্রীরাধার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না; যেহেতু, তাঁহারাই একাত্মা। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, কেবল সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হইতেই তাহা জানা যায়।

প্রভু যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ংভগবত্তার লক্ষণদ্বারা তাহাও পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে এবং তিনি যে শ্রীরাধাও, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায়, বিশেষতঃ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবদ্বারা, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

অস্ত্র ও পার্ষদ

পূর্ব্ব আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে বর্ত্তমান কলির উপাস্য এবং অবতার গৌরবর্ণ স্বয়ং ভগবানকে "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ" বলা হইয়াছে; অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গ হইল তাঁহার অস্ত্র এবং পার্ষদ—তাহারা অস্ত্র এবং পার্ষদের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাঁহার কি অন্য কোনও অস্ত্র বা পার্ষদ নাই?

রসিকশেখর স্বয়ংভগবানের স্বরূপগত নিজস্ব একটী কার্য্য আছে—রস-আস্বাদন। অপ্রকট-লীলাতে তিনি যেমন রস আস্বাদন করেন, প্রকটলীলাতেও তেমনি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার আস্বাদ্য রস উৎসারিত হয় তাঁহার লীলাতে। পরিকর ব্যতীত লীলা হয় না। তাই তাঁহার রসাস্বাদনের জন্য পরিকরের প্রয়োজন—উভয় লীলাতেই। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার লীলা-পরিকরদের সহিতই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভৃতি পরিকরবৃন্দের সহিতই অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরিকরই পার্ষদ।

প্রকটলীলাতে রসিকশেখর স্বয়ংভগবানের রস-আস্বাদনরূপ নিজস্ব কার্য্য ব্যতীত আরও একটী কার্য্য থাকে—ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের কল্যাণ-সাধন। ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জীবলোকে রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। বিশেষ কলিতে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি আপামর সাধারণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবেন বলিয়া দ্বাপরেই যে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রমাণসহ পূর্ব্বে

উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্য গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার সূচনাতেই তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—

চারিভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন।
—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।১৭

তিনি আরও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—

আপনি আচারি ভক্তি শিখাইমু সভারে।
শ্রীচৈ, চ, ১।৩।১৮

গৌর-অবতারে ইহাই ভগবানের জীব-কল্যাণাত্মক কার্য্য। প্রকট-লীলায় ভগবানের জীব-কল্যাণাত্মক কার্য্যেও তাঁহার পার্ষদবর্গ আনুকূল্য করিয়া থাকেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ নিজে যেমন প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাদিদ্বারাও তেমনি করাইয়াছেন; এবং নিজে আচরণ করিয়া যেমন ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও তদ্রূপ আদর্শ স্থাপন করাইয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় পার্ষদবৃন্দের সহিতই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দ তাঁহার লীলার আনুকূল্যও করিয়াছেন।

তথাপি তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাঁহার অস্ত্র ও পার্ষদ বলার তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার লীলাপরিকর পার্ষদবৃন্দও অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং প্রকটলীলার জীব-কল্যাণাত্মক কার্য্যে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অস্ত্র-পার্ষদের কাজ করিয়াছে। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দর্শনেই লোক প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। এইরূপে, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাঁহার প্রেম-বিতরণ-লীলার আনুকূল্য করিয়া পার্ষদের কার্য্য করিয়াছে।

কোনও কোনও অবতারে ভগবান্ অস্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হয়েন—অসুর-সংহারের জন্য। ইহাও তাঁহার জীব-কল্যাণাত্মিকা লীলা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই অবতারে তিনি অসুর সংহার করেন নাই, নাম-প্রেম বিতরণের দ্বারা অসুরদের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের অসুরত্বের সংহার করিয়াছেন। কাহারও প্রাণ-বিনাশ করিতে হয় নাই বলিয়া তাঁহার কোনও অস্ত্রের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দর্শনেই যখন অসুরগণ প্রেম লাভ করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অস্ত্রের কাজ করিয়াছে।

এইরূপে তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও অস্ত্র এবং পার্ষদের কাজ করিয়া থাকে বলিয়াই তাঁহাকে "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ" বলা হইয়াছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপ পার্ষদব্যতীত তাঁহার লীলাপরিকরগণও তাঁহার সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় উদ্ধৃত শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গিয়াছে—ব্রজবিলাসী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর এবং নবদ্বীপ-বিলাসী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর একই অভিন্ন পরব্রহ্ম-তত্ত্ব। তথাপি তাঁহাদের এক স্বরূপ হইতে অপর স্বরূপের বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে।

(১) রস-স্বরূপত্ব

পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্ম। রসো বৈ সঃ। —তিনি আনন্দ স্বরূপ, রসস্বরূপ।" শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—তিনি

"সর্ব্বরসঃ—সমস্ত রসের সমবায়; অশেষ-রসামৃতি-বারিধি।" রস-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা না জানিলে এই সমস্ত উক্তির ধারণা করা সম্ভব নয়।

রস্-ধাতু হইতে রস-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রস্-ধাতুর অর্থ আস্বাদন। রস-শব্দের দুইটী অর্থ। "রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ"—যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহা রস; আস্বাদ্য বস্তু; যেমন মধু। এই এক অর্থ। আর এক অর্থ হইতেছে, "রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ"—যিনি আস্বাদন করেন, তিনি রস; রস-আস্বাদক বা রসিক; যেমন ভ্রমর। রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম আস্বাদ্য-রসও এবং রস-আস্বাদক রসিকও—উভয়ই। তিনি যখন ব্রহ্মতত্ত্ব—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ব-বৃহত্তম তত্ত্ব—তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আস্বাদ্যত্ব এবং রসিকত্ব—এই উভয়ই তাঁহার মধ্যে সর্ব্বাতিশায়ী রূপে বিকশিত। এই দুইটী বিষয়েও তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই।

আস্বাদ্য-রস-স্বরূপের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। রস-শব্দের সাধারণ অর্থ আস্বাদ্য-বস্তু হইলেও রস-শাস্ত্রে আস্বাদ্য বস্তু মাত্রকেই রস বলা হয় না। যে আস্বাদ্য বস্তুতে চমৎকারিত্ব আছে, তাহাকেই রস বলা হয়; যেহেতু, রসশাস্ত্র-মতে "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।—রসের সার বা প্রাণবস্তু হইতেছে চমৎকারিত্ব; চমৎকারিত্ব না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তু রস নামে অভিহিত হইতে পারে না।" এই চমৎকারিত্ব হইতেছে—আস্বাদনের চমৎকারিত্ব; রস-বস্তুর পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। চমৎকারিত্ব-শব্দের অপর কোনও প্রতিশব্দ দেওয়া যায় না। পূর্ব্বে যাহা আস্বাদন করা হয় নাই, কিম্বা যাহার আস্বাদনের কথা পূর্ব্বে কখনও জানাও যায় নাই, এরূপ কোনও বস্তুর আস্বাদনে অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব মাধুর্য্যের অনুভবে চিত্তের যে একটা

স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই চমৎকারিত্ব বলে। এই চমৎকারিত্বের বাচনিকী অভিব্যক্তি হয়—"আঃ কি চমৎকার"-ইত্যাদি বাক্যে। যে আস্বাদ্য বস্তুতে এইরূপ চমৎকারিত্ব থাকে, তাহাকেই আস্বাদ্য রস বলা হয়।

এইরূপ চমৎকারিত্বের পরিমাণ কিরূপ হইলে আস্বাদ্য বস্তু বাস্তব রস নামে অভিহিত হইতে পারে, রসশাস্ত্রে তাহাও বলা হইয়াছে। আস্বাদন-জনিত সুখ যদি এত অধিক হয়, যাহাতে আস্বাদকের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় একমাত্র আস্বাদন-চমৎকারিত্বেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে, অন্য কোনও বস্তু সম্বন্ধে তাহাদের কোনও অনুসন্ধানই থাকেনা, তাহা হইলেই সেই চমৎকারি-সুখকে রস বলা হয়।

বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তর-রোধকম্।
স্বকারণ-সংশ্লেষি চমৎকারিসুখং রসঃ॥

(কোন্ অবস্থায় বা কি কারণে কোনও আস্বাদ্য বস্তু চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা লিখিত হইল না)।

লৌকিক রসও আছে ; কিন্তু তাহাতে রসত্বের বা চমৎকারিত্বের নিত্যত্ব নাই ; কিন্তু পরব্রহ্ম নিত্যবস্তু ; তাঁহার রসস্বরূপত্বও নিত্য ; সুতরাং তাঁহার আস্বাদন-চমৎকারিত্বও নিত্য এবং এই আস্বাদন-চমৎকারিত্বের পক্ষে—আস্বাদকের বহিরিন্দ্রিয়ের এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারান্তর-রোধকত্বও নিত্য। এই চমৎকারিত্ব হইতেছে নিত্য-নব-নবায়মান ; তাই ইহার চমৎকারিত্বের অবসান হয় না। নিত্য-নব-নবায়মান-চমৎকারিত্বময় নিত্য-নব-নবায়মান-মাধুর্য্য-সমন্বিত আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই হইতেছেন রস —আস্বাদ্য রস।

এক্ষণে আস্বাদক-রস-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—রসস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেছেন আস্বাদ্য এবং আস্বাদক, উভয়ই। তিনি কি আস্বাদন করেন? অবশ্য তিনি রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন; নচেৎ তাঁহাকে রস-আস্বাদক বা রসিক বলা হইত না। কিন্তু তিনি কি রস আস্বাদন করেন?

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আস্বাদন করেন আনন্দ-রস। তাঁহার আস্বাদ্য আনন্দ দুই রকমের—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। আনন্দ স্বতঃই মধুর, আস্বাদ্য। আর, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাঁহার স্বরূপ-শক্তির প্রত্যেক বৈচিত্রীতেই আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী আছেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-শক্তিও আস্বাদ্যা; অবশ্য হ্লাদিনীর পরিমাণের এবং গাঢ়তার তারতম্যানুসারে তাহার আস্বাদ্যত্বেরও তারতম্য হইয়া থাকে। পরমব্রহ্ম লীলা-পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার লীলা আছে, লীলা-পরিকর আছেন। হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি আবার প্রেমরূপেও পরিকরদের চিত্তে অবস্থিত। এই প্রেমও হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া স্বরূপতঃই আস্বাদ্য। লীলার ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের চিত্তস্থিত প্রেমরস উচ্ছ্বসিত এবং উৎসারিত হয়। এই প্রেমই—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া—বাস্তবিক শক্ত্যানন্দ এবং এই প্রেমরসই শক্ত্যানন্দ-রস।

স্বরূপ-শক্তি পরব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত—শক্তিরূপে এবং পরিকর-ভক্ত-বিষয়িণী প্রীতিরূপে। হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির সহায়তাতেই আনন্দ বা রসের আস্বাদন করা হয়। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনীদ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৫৩॥"

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্রহ্মতত্ত্ব—সর্ব্ববৃহত্তম তত্ত্ব, সকল বিষয়েই তিনি সর্ব্ববৃহত্তম; কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। "ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ কশ্চিৎ॥ শ্রুতি॥"

রসরূপেও তিনি সর্ব্ববৃহত্তম—আস্বাদ্য-রসরূপেও সর্ব্ববৃহত্তম, অসমোর্দ্ধ এবং আস্বাদক-রসরূপে, অর্থাৎ রসিকরূপেও তিনি সর্ব্ব-বৃহত্তম, রসিক-শেখর।

আস্বাদ্য-রসরূপে তাঁহার স্বরূপগত আনন্দ হইতেছে—অসমোর্দ্ধ আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রস। হ্লাদিনীর সহায়তায় তিনি তাহা আস্বাদন করেন—তিনি আত্মারাম। "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১২১॥"

আবার, লীলা-ব্যপদেশে পরিকর-ভক্তদের প্রেমরস-মাধুর্য্যও তিনি আস্বাদন করেন; ইহাই তাঁহার স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের আস্বাদন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তিনি "সর্ব্বরসঃ—অশেষ-রসামৃত-বারিধি, অনন্ত-রসবৈচিত্রীর সমবায়।" তাঁহার অনন্ত-রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই হইতেছেন নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ। এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরও লীলা আছে, লীলা-পরিকর আছেন। বিভিন্ন রসবৈচিত্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। ইঁহাদের প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই যথাযথ ভাবে স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করিতেছেন। শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই রসবৈচিত্রীর তারতম্য এবং রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ ভগবৎ-স্বরূপগণেরও তারতম্য। সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ—সুতরাং রসত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ—কেবলমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে।

প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের স্বরূপানন্দই এবং স্বরূপানন্দের অন্তভু ক্ত বিগ্রহ-মাধুর্য্যও পরম-আস্বাদ্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের স্বরূপানন্দ এবং মাধুর্য্য পরমতম আস্বাদ্য। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য্য—

কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,
বলে হরে তা-সভার মন।

পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২১।৮৮

অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণ—
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন ॥
আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন ॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১৪

আবার, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের শক্ত্যানন্দও পরম-লোভনীয় ; কিন্তু পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের শক্ত্যানন্দ—পরমতম লোভনীয়। —এমন কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও পরমতম-লোভনীয়। কেন এবং কিরূপে, তাহা বলা হইতেছে।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে স্বভাবতঃই মাধুর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সুতরাং যে সকল লীলায় ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান—ভগবানের মধ্যে এবং তাঁহার পরিকর-বৃন্দের মধ্যেও—বর্ত্তমান, সে-সকল লীলায় মাধুর্য্যের অপ্রতিহত বিকাশ সম্ভব নয় ; মাধুর্য্য-বিকাশের তারতম্য অনুসারেই লীলারসের লোভনীয়তারও তারতম্য হয়। সুতরাং যেস্থলে ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে না, সে-স্থলেই মাধুর্য্যের অব্যাহত বিকাশ এবং লোভনীয়তারও চরমতম বিকাশ।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বরূপতঃ নরবপু এবং নিত্য-নরলীল। ব্রজধামই হইতেছে তাঁহার নরলীলার ধাম। এই নরলীলাতে মাধুর্য্যের যেমন পূর্ণতম বিকাশ, ঐশ্বর্য্যেরও তেমনি পূর্ণতম বিকাশ ; যেহেতু, লীলাবিলাসী হইতেছেন পরব্রহ্ম। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ-সত্ত্বেও মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য—এত প্রাধান্য যে, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত থাকিয়া, মাধুর্য্যের দ্বারা নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া

মাধুর্য্যেরই সেবা করিয়া থাকে, রসিক-শেখরের রসাস্বাদিকা লীলার—সুতরাং রসাস্বাদনের—পুষ্টিবিধান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা করে—নিজের স্বরূপকে দৃশ্যমান্ ভাবে প্রকটিত না করিয়া। এই লীলাতে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন, লীলার মাধুর্য্যই থাকে সর্ব্বতোভাবে দেদীপ্যমান, নিত্য-নবনবায়মান। তাই অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপরূপে পরব্রহ্ম যে লীলা করেন, তাহা অপেক্ষা স্বয়ংরূপের লীলা হইতেছে সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষময়ী।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।

—শ্রীচৈ, চ, ২।২১।৮৩

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই সর্ব্বলীলোৎকর্ষময়ী নরলীলার মধ্যে আবার রাসলীলা হইতেছে—সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি; যেহেতু, এই রাসলীলা হইতেছে পরম-রস-কদম্বময়ী; পরম-রস-সমূহের যুগপৎ অভিব্যক্তি কেবলমাত্র রাসলীলাতেই সম্ভব। এই রাসলীলাসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাতা মনোহরা।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনোমে কীদৃশং ভবেৎ॥

—আমার অনেক লীলা আছে; প্রত্যেক লীলাই আমার মনোহারিণী; কিন্তু রাসলীলার কথা স্মরণ হইলে আমার মনের যে কি অবস্থা হয়, মন যে কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে, তাহা বলিতে পারি না।

এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে যে শক্ত্যানন্দ উৎসারিত হয়, তাহা পরমতম-লোভনীয়—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও পরমতম-লোভনীয়।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই পরমতম লোভনীয় শক্ত্যানন্দও আস্বাদন করেন। তাহাতেই তাঁহার রসিকত্ব।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় পরব্রহ্মের রস-স্বরূপত্বের একটু আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে রসস্বরূপত্বে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বৈশিষ্ট্য কি, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

(২) স্বরূপানন্দ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীবিগ্রহের বা রূপের মাধুর্য্যও স্বরূপানন্দের অন্তর্ভূক্ত।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মাধুর্য্যের চরমতম বিকাশ তাঁহার মদনমোহনরূপে। এই মদনমোহনরূপেই (মন্মথ-মন্মথরূপে) তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, এমন কি, স্বয়ং মদনকে পর্য্যন্তও মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১০

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপে যে মাধুর্য্যের বিকাশ, তাহা যে মদনমোহন-রূপের মাধুর্য্য অপেক্ষাও সর্ব্বাতিশায়ীরূপে উন্মাদনাজনক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সুতরাং স্বরূপানন্দের দিক্ দিয়া পরব্রহ্মের শ্যামসুন্দর-রূপ অপেক্ষা যে গৌরসুন্দর-রূপেরই উৎকর্ষ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের কৃষ্ণত্বের (সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বের) পূর্ণতম বিকাশ যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপেই, তাহা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না।

(৩) আস্বাদক রসস্বরূপ।

(ক) স্বরূপানন্দের আস্বাদক রসিক।

মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে প্রেম ; যিনি প্রেমের আশ্রয়, তিনিই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন—ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আশ্রয়-জাতীয় প্রেমেরও আবার অনেক স্তর আছে ; স্তর-ভেদে মাধুর্য্যাস্বাদনেরও তারতম্য হইয়া থাকে। পূর্ণতম-বিকাশময় স্তরের—মাদনাখ্য-মহাভাবের—আশ্রয় হইতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-কৃষ্ণে এই মাদনাখ্য মহাভাবের বিকাশ নাই ; সুতরাং তিনি স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন না।

কিন্তু "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-কৃষ্ণে মাদনের পূর্ণতম বিকাশ ; সুতরাং এই স্বরূপেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব।

সুতরাং মাধুর্য্যের আস্বাদক রসিক হিসাবেও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উৎকর্ষ স্বীকার করিতেই হইবে।

(খ) শক্ত্যানন্দের আস্বাদক রসিক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শক্ত্যানন্দের আস্বাদন হইতেছে—প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-কৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলায় চারিভাবের রস আস্বাদন করেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই চারিভাবেরই তাঁহার অনাদি-সিদ্ধ নিত্য পরিকর আছেন। দাস্যভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে দাস্যরস, সখ্যভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে সখ্যরস, বাৎসল্যভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে বাৎসল্যরস এবং মধুর-ভাবের পরিকরদের সহিত লীলাতে মধুর-রস উচ্ছ্বসিত ও উৎসারিত হয় ; তিনি তাহা নিজেও আস্বাদন করেন এবং তাঁহার পরিকর-

বৃন্দকেও আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি আস্বাদন করেন প্রেমের বিষয়রূপে এবং পরিকরগণ আস্বাদন করেন প্রেমের আশ্রয়রূপে। দাস্য-সখ্যাদির বৈচিত্রীবিশেষের আশ্রয়রূপেও তিনি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু মধুরভাবের মুখ্যতম পরিকর শ্রীরাধার প্রেমের তিনি কেবলমাত্র বিষয়—আশ্রয় নহেন। সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয়রূপে যে শক্ত্যানন্দের আস্বাদন, তাহা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের পক্ষে দুর্ল্ভ।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-কৃষ্ণ রাধাশ্যামের মিলিত স্বরূপ বলিয়া তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভাবও আছে, আবার শ্রীরাধার ভাবও আছে। স্বমাধুর্য্য (অর্থাৎ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মাধুর্য্য) আস্বাদনই তাঁহার মুখ্য স্বরূপানুবন্ধী কার্য্য বলিয়া তাঁহাতে শ্রীরাধার ভাবেরই আধিক্যে বিকাশ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভাবের বিকাশ যে নাই, তাহাও নয়। এস্থলে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণভাবে তৈর্থিক-ব্রাহ্মণাদির এবং ঈশানাদির সেবায় দাস্যরস, রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, অভিরামাদির সঙ্গে সখ্যরস, শ্রীশচীমাতা ও শ্রীমিশ্রপুরন্দরের সঙ্গে বাৎসল্যরস এবং গদাধরাদি সহচরগণের সঙ্গে সুরধুনীতে নৌকা-বিলাসাদিতে মধুর-রসও আস্বাদন করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে মহাজনোক্তিই প্রমাণ। গোষ্ঠলীলার গৌরচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় :—"আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥ শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি। হৈ হৈ বলিয়া গোরা ঘুরায় পাঁচনি॥" আবার—"গৌর কিশোর, পূরব রসে গর গর, মনে ভেল গোষ্ঠবিহার। দাম শ্রীদাম, সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার॥ বেত্র বিষাণ, সাজ লেই যাজন, যায়ব ভাণ্ডীর সমীপ। গৌরীদাস, সাজ করি

তখনে, গৌর নিকটে উপনীত ॥” শিঙ্গা-বেণু-বেত্র-বিষাণ-সাজে সজ্জিত হইয়া দাম-শ্রীদাম-সুবলাদিকে সঙ্গে লইয়া হৈ হৈ রবে ধবলী-শ্যামলী আদি গাভীগণকে ফিরাইয়া শ্রীকৃষ্ণই ভাণ্ডীরাদি বন-সমীপে গোচারণে গিয়া থাকেন—শ্রীরাধা এভাবে গোচারণে যায়েন না। তাই স্পষ্টই বুঝা যায়, উল্লিখিত পদ সমূহে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণভাবই প্রকটিত হইয়াছে। ইহা সখ্যভাবের উদাহরণ।

শৈশবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মৃদ্‌ভক্ষণ, কালো-হাঁড়ীর স্তূপে উপবেশন, গৃহের জিনিস-পত্রের অপচয়, গঙ্গাঘাটে দুরন্ত-পনার দরুণ মিশ্রপুরন্দর-কর্তৃক তাঁহার শাসন-প্রভৃতি বাল্যলীলায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাবে বাৎসল্য-রসাস্বাদনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নীলাচলে কৃষ্ণ-জন্মযাত্রায় গোপভাবে আবিষ্ট হইয়া নন্দমহারাজের সাজে সজ্জিত কানাই-খুঁটিয়ার চরণ-বন্দনাদিতেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাবে বাৎসল্য-রসাস্বাদনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবে মধুর-রসাস্বাদনের দৃষ্টান্তও মহাজনের পদে দৃষ্ট হয়। যথা, নৌকাবিলাসের গৌরচন্দ্রেঃ—“না জানিয়ে গোরাচান্দের কোন্ ভাব মনে। সুরধুনীতীরে গেলা সহচর-সনে ॥ প্রিয়-গদাধর-আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া ॥ আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥” আবার—“আরে মোর গৌরাঙ্গ নায়। সুরধুনী মাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হৈয়া, সহচর মেলিয়া খেলায় ॥ প্রিয়-গদাধরসঙ্গে, পূরব রভস্-রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি। ডুব ডুব করে না, বহায় বিষম বা, দেখি হাসে গোরা বনমালী ॥” এই শেষোক্ত পদে প্রভুকে “গোরা বনমালী” বলাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তিনি কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়া ছিলেন; গোরাবনমালী—গোরারূপ বনমালী (কৃষ্ণ), বনমালীর

(কৃষ্ণের) ভাবে আবিষ্ট গোরা। বিশেষতঃ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণই যমুনা-গর্ভে নৌকা ভাসাইয়া "আপনি কাণ্ডারী হৈয়া" নৌকা বাহিয়াছিলেন এবং "বিষম বাতাস বহাইয়া নৌকাখানিকে ডুব ডুব করিয়াছিলেন।" শ্রীমতী রাধিকা এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রে আরও পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায়। —"আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥ রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে॥ খেনে খেনে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। রাধানাম বলি খেনে খেনে মূরছায়॥"—শ্রীরাধার বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাধানাম জপ করিতেন, রাধা-রাধা বলিয়া কান্দিতেন ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঠিক সেই ভাবই উক্ত পদে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখা যায়—

সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখ-দান-হেতু তৈছে রামরায়॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।৬।৮

এস্থলেও নীলাচলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণভাবের কথাই বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণভাবেও শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করিয়াছেন। তাঁহার রাধাভাব তো অতি প্রসিদ্ধ; তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সুতরাং শক্ত্যানন্দের আস্বাদন বিষয়েও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। স্বরূপানন্দের আস্বাদনেও যে শ্রীশ্রীগৌর-

সুন্দরের উৎকর্ষ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল—রসাস্বাদনের ব্যাপারে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরই উৎকর্ষ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেই রসিকত্বের বিকাশ বেশী।

(৪) রস-স্বরূপে বিষয় ও আশ্রয়

পরব্রহ্ম রসস্বরূপ বলিয়াই পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই আস্বাদন দুই ভাবে হইয়া থাকে—প্রেমের বিষয়রূপে এবং প্রেমের আশ্রয়রূপে।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১১

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-কৃষ্ণ যে সকল ভক্তের সকল রসের বা সকল ভাবের—সকল প্রেমস্তরেরই—বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় নহেন ; প্রেমের অন্য স্তরের আশ্রয় বটেন।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-কৃষ্ণ রাধাশ্যাম-মিলিত স্বরূপ বলিয়া মাদনেরও আশ্রয়—সমস্ত প্রেমস্তরেরই বিষয় এবং আশ্রয়। বিষয় এবং আশ্রয়—এই উভয়-বৈচিত্রীই তাঁহাতে পূর্ণতমরূপে বিরাজিত।

সুতরাং প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয়ের দিক্ দিয়াও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর হইলেন—বিষয়-প্রধান-স্বরূপ। আর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন—বিষয়াশ্রয়-স্বরূপ, যদিও লীলার দিক্ দিয়া তাঁহাকে আশ্রয়-প্রধান-স্বরূপই বলা যায়।

(৫) রস-স্বরূপত্ব ও পরিকর

পরব্রহ্ম রসস্বরূপ বলিয়াই লীলা করিয়া থাকেন—লীলারস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে। তিনি লীলা করেন তাঁহার পরিকরদিগের সঙ্গে।

পরিকরের স্বরূপ-বিচারেও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরে এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের লীলায় ভাবভেদে ধামভেদ দৃষ্ট হয়। পরব্যোমে তাঁহার ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা; দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-মিশ্রিতা লীলা; ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী নরলীলা। শ্যামসুন্দরের ব্রজলীলাতে দেব-ভাবাপন্ন বা ঐশ্বর্য্যভাবাপন্ন কোনও পরিকর নাই; লক্ষ্মীদেবী কান্তা-ভাবে ব্রজলীলায় শ্যামসুন্দরের সেবাভিলাষিণী হইয়া উৎকট তপস্যাও করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সেবা পায়েন নাই। কান্তাভাবময়ী লীলা কেবলমাত্র গোপীস্বাভিমানিনীদের সঙ্গেই হইয়াছিল; ব্রাহ্মণবংশজাতা যজ্ঞপত্নীগণও কান্তাভাবের সেবা পায়েন নাই।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় সকল ভাবের পরিকরই দৃষ্ট হয়। শ্রীবাসপণ্ডিতে নারদের স্বভাব, ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাব; তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। শ্রীল মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। গৌর-ঘরণী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী বা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ব্রজপরিকর ছিলেন না। কবিকর্ণপূরের মতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেছেন স্বয়ং-লক্ষ্মী (ব্রজলীলা-সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ণ বাসনা কি নবদ্বীপ-লীলাতেই একভাবে পূর্ণ হইয়াছে?); কাহারও কাহারও মতে তিনি জানকী ও রুক্মিণীর মিলিত বিগ্রহ। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—ভূ-স্বরূপিণী।

ভাবের প্রাতিকূল্যবশতঃ ঐশ্বর্য্যভাবময় বৈকুণ্ঠের এবং ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যভাবময় দ্বারকার যে সমস্ত পরিকরের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা সেই সেই ধামে অপূর্ণ থাকে, রসত্বের এবং কারুণ্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বোধ হয় স্বীয়ধামে পরিকরত্ব দান করিয়া তাঁহাদের বাসনাই, তাঁহাদেরও আশাতীতভাবে, পূর্ণ করিয়া থাকেন।

নবদ্বীপ-লীলায় আবার এক পরিকরের মধ্যেও দ্বাপরের একাধিক পরিকরের ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন—শ্রীল রায়রামানন্দ—তাঁহাতে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের প্রিয় নর্ম্মসখা অর্জ্জুন, ব্রজের বিশাখা এবং অর্জ্জুনীয়া সখী এবং সুবলের ভাবও দৃষ্ট হয়।

এইরূপে দেখা যায়—গৌর-পরিকরদের মধ্যে ভাবের মিশ্রণ আছে, স্বরূপের মিশ্রণও আছে; কিন্তু ব্রজপরিকরদের মধ্যে এইরূপ মিশ্রণ দৃষ্ট হয় না।

আবার ব্রজের কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ নবদ্বীপ-লীলায় পুরুষদেহে বিরাজিত; যেমন—শ্রীল গদাধরপণ্ডিতগোস্বামী, স্বরূপদামোদর, রায়রামানন্দ, নরহরি-সরকারঠাকুর, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনগোস্বামী-আদি। ব্রজলীলায় ইহাঁরা সকলেই গোপীদেহে অবস্থিত। কিন্তু নবদ্বীপে দেহের পার্থক্য থাকিলেও ভাবের পার্থক্য নাই—ব্রজের ন্যায় নবদ্বীপেও তাঁহাদের কান্তাভাব—মহাভাব। ব্রজলীলাতে কান্তারসের আস্বাদনে দৈহিক-সম্ভোগাদিও আছে; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলাতে তাহা নাই। ইহা এক বৈশিষ্ট্য। ইহাতে বুঝা যায়—দৈহিক-বিলাসই আস্বাদনের বস্তু নহে, আস্বাদনের বস্তু হইতেছে—ভাব, প্রেম। দৈহিক বিলাস হইতেছে প্রেমরস-নির্য্যাস উৎসারণের একতম উপায় মাত্র—একমাত্র উপায়ও নহে (লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে ২।৮।২৩৩-৩৪ পয়ারের টীকা-পরিশিষ্টের শেষাংশে এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে)।

(৬) রস-স্বরূপত্ব ও করুণা।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ ॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৫

তাঁহার রসিক-শেখরত্বই বড় গুণ, না পরম-করুণত্বই বড় গুণ—ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় পরম-করুণত্বই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। পরম-করুণ বলিয়াই তিনি ভক্তবশ। তাঁহার ভক্তবশ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ; দামবন্ধন-লীলায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তবশ্যতা যখন করুণা হইতেই উদ্ভূত, তখন করুণাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলা যায়।

একভাবে দেখিতে গেলে, তাঁহার রসিক-শেখরত্বকে তাঁহার পরম-করুণত্বেরই অঙ্গ বলা যায়। পরম-করুণ বলিয়াই তিনি রসিক-শেখর; তিনি রসিক না হইলে তাঁহার করুণা পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, পত্রে-পুষ্পে শাখা-প্রশাখায় সুসজ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাঁহার প্রীতিরসের ভাণ্ডার নিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত; শ্রীকৃষ্ণের সেবার ব্যপদেশে ভক্ত তাঁহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ পরম-করুণ বলিয়া ভক্তের এই প্রীতিরসকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; তিনি তাহা অঙ্গীকার করেন, পরমানন্দে আস্বাদন করেন—কেবল ভক্তের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত। তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন, তাঁহার যত কিছু লীলা, তৎসমস্তই তাঁহার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে। "মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" সুতরাং ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের ইচ্ছা হইতেই প্রীতিরসের আস্বাদন এবং প্রীতিরসের আস্বাদনেই তাঁহার রসিকত্ব। মুখ্য হইল ভক্তের আনন্দ-বর্দ্ধনের ইচ্ছা—যাহার মূল হইতেছে করুণা, আর রসাস্বাদন হইল গৌণ। করুণাবশতঃ ভক্তচিত্ত-বিনোদনের ইচ্ছা না জন্মিলে ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই বলা যায়—তাঁহার রসিক-শেখরত্ব হইল তাঁহার করুণাময়ত্বের অঙ্গ।

প্রশ্ন হইতে পারে—রসিক-শেখর বলিয়াই তিনি পরম-করুণ ; রসিক বলিয়া তাঁহার রসাস্বাদন-স্পৃহা এবং এই স্পৃহার পরিপূরণের জন্য রসপাত্র-ভক্তের প্রতি তাঁহার করুণা—এইরূপও তো হইতে পারে ? ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে রসিক-শেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করুণত্ব হয় তাহার অঙ্গ।

এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই। রসাস্বাদন-স্পৃহার পরিপূরণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিরসের পাত্র ভক্তের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন—ইহা মনে করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণে সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপরতার আরোপ করিতে হয়। সর্ব্ববৃহত্তম ব্রহ্মবস্তুতে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতার স্থান থাকিতে পারে না। আবার, ঐরূপ মনে করিতে গেলে ভক্তদের প্রতিও যেন অবিচার করা হয়—রস-পরিবেশন-ব্যাপারে তাঁহারা যেন কৃপার প্রত্যাশা পোষণ করেন বলিয়া মনে হয় ; তাঁহাদের রস-পরিবেশন-বাসনার স্বতঃ-স্ফূর্ত্ততা যেন থাকে না ; ইহা কিন্তু প্রীতি-বিরোধী। আর একদিক্ দিয়াও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের প্রতিও ভগবানের তেমনি প্রীতি। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥"—এইরূপই শ্রীভগবদুক্তি। এই প্রীতি হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল পরমুখী—বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্রয়মুখী নহে। তাই কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—প্রীতি-বিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দ। তাহাঁ নাহি নিজ সুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৬৯॥" ভক্ত যেমন চাহেন একমাত্র ভগবানের সুখ, ভগবান্‌ও চাহেন একমাত্র ভক্তের সুখ ; নিজ-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও কাহারও মধ্যে নাই। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের সম্ভোগ-প্রকরণের "দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এজন্যই লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাৎ পরস্পর-সুখ-তাৎপর্য্যত্বেন পারস্পরিকাৎ।" এই পারস্পরিকী সুখবাসনা উভয়ের—ভক্ত ও ভগবান্-এতদুভয়ের—মধ্যেই স্বাভাবিকী। প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। রস-আস্বাদনের লালসাতেই যদি ভগবান্ ভক্তের প্রতি প্রীতি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তপ্রীতি স্বসুখ-বাসনা-প্রসূত হইত, স্বাভাবিকী হইত না, নিরুপাধিকীও হইত না। কিন্তু বস্তুতঃ একমাত্র করুণা হইতেই ভক্তপ্রীতির উন্মেষ, রসাস্বাদন-বাসনা হইতে নয়। ভক্তের আনন্দবর্দ্ধনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য ; ভগবানের পক্ষে ভক্ত-প্রেমরস-মাধুর্য্য আস্বাদনের স্পৃহা ভক্তের আনন্দ-বর্দ্ধনের ইচ্ছারই অঙ্গীভূত। এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মা বলিয়াছেন—ভক্তের আনন্দ-সম্ভার-বর্দ্ধনের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। "প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতং প্রভো॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩৭॥" অপ্রকট-লীলাতেও ইহাই তাঁহার স্বরূপগত প্রধান বাসনা, প্রকট লীলাতেও। এ-সমস্ত আলোচনা হইতে মনে হয়—রসিক-শেখরত্বকে অঙ্গী এবং করুণত্বকে তাহার অঙ্গ বলা সঙ্গত হয় না।

বিষয়টী অন্যভাবেও বিবেচিত হইতে পারে। ভগবানের করুণাও তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি—সুতরাং করুণাও মধুর। তাঁহার রূপমাধুর্য্য যেমন তাঁহার স্বরূপানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত, তেমনি করুণাও তাঁহার স্বরূপানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি রস-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার করুণাও পরম-মধুর। রূপের ন্যায় করুণাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত। রস-স্বরূপত্বের সঙ্গে রূপমাধুর্য্যের যেমন ভেদাভেদ সম্বন্ধ, করুণার বা করুণা-মাধুর্য্যেরও তেমনি ভেদাভেদ সম্বন্ধ ; রস-স্বরূপত্ব হইতে রূপমাধুর্য্য যেমন অবিচ্ছেদ্য, করুণাও তেমনি অবিচ্ছেদ্য। যেখানে রস-স্বরূপত্বের বিকাশ, সেখানে করুণারও বিকাশ

এবং রস-স্বরূপত্বের যতটুকু বিকাশ, করুণারও ততটুকুই বিকাশ ; সুতরাং যেস্থলে রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ, সেস্থলে করুণত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে রসস্বরূপত্ব ও করুণত্বের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের প্রশ্ন—কোন্‌টী অপরটীর হেতু, সেই প্রশ্ন—উঠাইবারও প্রয়োজন হয় না।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-কৃষ্ণে যে রস-স্বরূপত্বের বিকাশ বেশী, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণে করুণার বিকাশও বেশীই হইবে। গৌর-করুণার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশের উজ্জলতম দৃষ্টান্ত —নির্ব্বিচারে প্রেম-বিতরণ।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-কৃষ্ণও প্রেম দান করেন, কিন্তু সাধারণতঃ নির্ব্বিচারে প্রেমদান করেন না। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৮।১৬

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ভুক্তি বা মুক্তি লাভ করিয়াই সাধক যদি সন্তুষ্ট হয়েন, নিজেকে পরম কৃতার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রেমভক্তি দেন না ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারেন—ভুক্তি বা মুক্তিই সাধকের পরমতম কাম্য, প্রেমভক্তি তাঁহার কাম্য নহে ; সুতরাং প্রেমভক্তি-লাভের যোগ্যও সাধক নহেন। তাই তিনি তাঁহাকে প্রেমভক্তি দেন না। এস্থলে বিচার দৃষ্ট হয়।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেমদান-বিষয়ে এইরূপ কোনও বিচার করেন না। যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার না করিয়াই প্রকট-লীলায় তিনি প্রেমভক্তি দান করিয়া থাকেন। যিনি প্রেম চাহেন,

তাঁহাকে তো দেনই, যিনি চাহন না, তাঁহাকেও দেন। "প্রেম দিব" ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জানেন, "দিবনা"—ইহা তিনি জানেন না। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই নির্ব্বিচার করুণার বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়াই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—

মাগে বা না মাগে কেহো—পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি—জানে দিব মাত্র॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৮।২৭

যে প্রেম দান করা হয়, তাহারও অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর কান্তাপ্রেম দান করেন না; শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাহাও করেন। তাহার হেতুও আছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর-কৃষ্ণ কান্তাপ্রেমের অখণ্ড-ভাণ্ডারের অধিকারী নহেন; শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-কৃষ্ণ রাই-কানু-মিলিত স্বরূপ বলিয়া অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী; তাই তিনি "উন্নত-উজ্জ্বল-রস-স্বরূপা স্বভক্তি-সম্পত্তি"—কান্তাপ্রেমও—নির্ব্বিচারে, যাহাকে-তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। এতই অধিক করুণার বিকাশ তাঁহার মধ্যে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার করুণাকেই যেন স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া, করুণাকেই যেন নিজের পরিচালিকা করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।১৪।১৪

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুসন্ধান ব্যতীতও তাঁহার কৃপা জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকে।

(লেখকের "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক গ্রন্থে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের করুণার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে)।

(৭) রস-স্বরূপত্ব ও অসুর-সংহার

রস-স্বরূপত্বের উৎকর্ষবশতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণার উৎকর্ষের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। করুণার এই উৎকর্ষবশতঃই আবার অসুর-সংহার-বিষয়েও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর অসুর সংহার করিয়াছেন—অসুরের প্রাণ বিনাশ করিয়া; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অসুর সংহার করিয়াছেন—অসুরের অসুরত্ব বিনাশ করিয়া, প্রাণ বিনাশ করিয়া নয়। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের অসুর-সংহারও অসুরের প্রতি করুণা; যেহেতু, নিহত অসুর ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু অসুর যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ এই করুণার উপলব্ধিও করিতে পারেনা, তাহার মাধুর্য্যের অনুভব তো দূরে। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অসুর-সংহারে (অর্থাৎ অসুরত্বের সংহারে) অসুর করুণার এবং করুণার মাধুর্য্যের অনুভব এবং আস্বাদন লাভ কয়িয়া এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। রস-স্বরূপের রসের ফোয়ারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অসুর-সংহার-লীলাকেও মাধুর্য্যময়ী করিয়া তোলে।

(৮) রস-স্বরূপত্ব ও গতিদায়কত্ব

স্বয়ংভগবান্ হতারি-গতিদায়ক। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর এবং শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর—উভয়রূপেই তিনি তাঁহার হস্তে নিহত অসুরকে গতি দিয়া থাকেন; কিন্তু উভয়ের প্রদত্ত গতি এবং গতির প্রসার এক রূপ নহে।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর স্বহস্তে নিহত অসুরকে সাযুজ্যমুক্তি দিয়া থাকেন। সাযুজ্যমুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাবই স্ফুরিত হয় না, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবার

আনন্দ লাভ তো দূরে। অসুরের মধ্যে থাকে ভগবদ্‌বিষয়ে প্রাতিকূল্য; তাই অসুর ভগবৎ-সেবা বা ভগবৎ-প্রেম লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর এই প্রাতিকূল্য দূর করেন না। অসুর-সম্বন্ধে তাঁহার কারুণ্যের বিকাশ কেবল মুক্তিদানপর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন-দান পর্য্যন্ত। অসুরের সাযুজ্যমুক্তিরূপা গতি কেবল সিদ্ধলোকেই (সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের প্রাপ্য ধামেই) সীমাবদ্ধ থাকে।

কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অসুরত্ব-বিনাশরূপ অসুর-সংহারের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। পূর্ণতম-বিকাশময় রস-স্বরূপত্বের রসধারার প্রবল-প্লাবনে অসুরের অসুরত্ব বহুদূরে অপসারিত হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎ-প্রাতিকূল্যও সম্যক্‌রূপে বিধৌত হইয়া যায়। আর রস-স্বরূপত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ-বৈচিত্রীরূপ করুণা সেই প্রাতিকূল্যের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেন ভগবদ্‌বিষয়ে আনুকূল্যকে এবং তাহাকে কৃতার্থ করেন—ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ ব্রজপ্রেম দান করিয়া। এই প্রেম-প্রাপ্তিরূপা গতি—প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, সিদ্ধলোক, পরব্যোম এবং দ্বারকা-মথুরাকেও অতিক্রম করিয়া শুদ্ধমাধুর্য্যময় ধাম ব্রজলোকে যাইয়া স্থিতি লাভ করে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে—গতিদায়কত্বেরও এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যময় বিকাশ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে।

———

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, নবদ্বীপও তেমনি ব্রজেরই আবির্ভাব-বিশেষ ; ব্রহ্মাণ্ডে তাহা প্রকটিত হইয়াছে মাত্র।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরে এবং শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরে যেমন স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই, ব্রজলীলায় এবং নবদ্বীপলীলায়ও তদ্রূপ স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই। রসিক-শেখর পরব্রহ্ম ব্রজধামে যে লীলাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাই যেন প্রবলবেগে ধারণ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে—অবশ্য অনাদিকালেই। নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলা—রসিক-শেখরের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র। রসিকশেখরের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় লীলাকদম্বের পূর্ব্বাংশ যেন ব্রজলীলা এবং উত্তরাংশ নবদ্বীপলীলা। নানা কারণে ইহাও মনে হয়—ব্রজলীলার পরিণত অবস্থাই নবদ্বীপলীলা। যে উদ্দেশ্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। তাঁহার লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য—ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন এবং গৌণ উদ্দেশ্য—রাগমার্গের ভক্তি প্রচার।

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম্ ॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৪-১৫

এই দুইটী উদ্দেশ্যের মধ্যে ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনটী হইতেছে রসিক-শেখরের স্বরূপানুবন্ধিন। নিত্যলীলা ; এই লীলা অপ্রকট-ধামেও আছে, প্রকট-ধামেও আছে ; প্রকটের বিশেষত্ব এই যে, যে-প্রেমরস-বৈচিত্রীর আস্বাদন অপ্রকটে সম্ভব নয়, প্রকটে তাহা আস্বাদন করেন—প্রকটে জন্মলীলাদি থাকে বলিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে। আর রাগ-মার্গ-ভক্তির প্রচার হইতেছে জীববিষয়িণী লীলা ; ইহা কেবল প্রকট-লীলাতেই হইয়া থাকে।

প্রকট এবং অপ্রকট—এই উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী রসাস্বাদিকা লীলা করিয়া থাকেন এবং অশেষ-বিশেষে পরিকর-ভক্তগণের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনও করিয়া থাকেন। তথাপি কিন্তু তাঁহার রস-আস্বাদন-বাসনা পূর্ণতা লাভ করে না। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের বাসনা হয়তো পূর্ণতা লাভ করে—প্রকট এবং অপ্রকট-এই উভয় লীলার সমবায়ে ; কিন্তু স্বীয় অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-রসটী আস্বাদন করিতে পারেন না—প্রকটেও না, অপ্রকটেও না। ইহার কারণ এই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব ; ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনের কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। এই প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন সম্ভব নহে। রাই-কানু-মিলিত গৌররূপে এই মাদন আছে বলিয়া এই রূপেই কৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব। রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-কৃষ্ণরূপেই স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করেন—প্রকট-নবদ্বীপে এবং অপ্রকট-নবদ্বীপেও। ইহাতেও দেখা যায়—রস-আস্বাদনের যে অংশ ব্রজলীলায় অপূর্ণ থাকে, নবদ্বীপ-লীলাতেই তাহা পূর্ণতা লাভ করে।

আর, করুণাবশতঃ রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"-ইত্যাদি বাক্যে রাগমার্গ-ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন; তাহাও কেবল দিগ্‌-দর্শনরূপে। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীশ্রীগৌর-রূপে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহার অতি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, দ্বাপর-লীলায় অর্জ্জুনের নিকটে উপদেশমাত্রই দিয়াছেন; কিন্তু ভজনের কোনও আদর্শ স্থাপন করেন নাই। কিন্তু কলির গৌররূপের লীলায় তাঁহার সঙ্কল্পই ছিল—"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥ শ্রীচৈ, চ, ১৷৩৷১৮-১৯॥" নবদ্বীপ-লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিজেও ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদবর্গের দ্বারাও করাইয়াছেন। তাহাতে জীব ভজনের একটা অত্যুজ্জ্বল আদর্শ পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, উপদেশানুরূপ ভজনে জীবকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এমন সব লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, যাহার কথা শুনিয়া লোক ভজনের জন্য লুব্ধ হইতে পারে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
—শ্রীভা, ১০৷৩৩৷৩৬

ব্রজলীলায় তাঁহার পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া, তাঁহার সেবায় যে কি অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে, তাঁহারই সহিত একই সঙ্গে লীলারস-সমুদ্রে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া সন্তরণ করিতে করিতে যে অপরিসীম আনন্দের উপভোগ সম্ভব—তাহার কথা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সেই লীলা তিনি জীবকে দেখাইয়া যায়েন নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে নবদ্বীপ-লীলায় তিনি—প্রেমানন্দের বিভিন্ন

বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া—তাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন (শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য-নামক গ্রন্থে "প্রেমের স্বরূপ-প্রকাশে করুণার বৈশিষ্ট্য"-প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে)। ব্রজলীলায় যাহা কেবল শুনাইয়াছেন, নবদ্বীপ-লীলায় তাহা দেখাইয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল, তাঁহার রাগমার্গ-ভক্তি-প্রচারেরও আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে।

রসিক-শেখরের প্রেমবশ্যতার বিকাশেও ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার উৎকর্ষ। ব্রজে রাসলীলায় "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্"-ইত্যাদি (শ্রী.ভা, ১০।৩২।২২)-বাক্যে কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সেই ঋণিত্বের পর্য্যবসান যে কোথায়, নবদ্বীপ-লীলাতেই তাহা দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলায় তিনি শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া কার্য্যেও তাঁহার ঋণিত্ব খ্যাপন করিলেন এবং ঋণিত্বের পর্য্যবসান কোথায়, তাহাও দেখাইলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-রহস্যের দিক্ দিয়াও নবদ্বীপ-লীলাকে ব্রজ-লীলার পরিণত অবস্থা বলিয়া মনে করা যায়। নিতান্ত ঘনিষ্ঠতম মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের স্বতন্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় না। কিন্তু নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া আছেন। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।"

লীলার স্বরূপ বুঝা যায় লীলা-পরিকরদের স্বরূপের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকরবর্গও নবদ্বীপ-লীলার উপযোগী দেহে নবদ্বীপে বিরাজিত। ইহা দ্বারাও ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার স্বরূপগত অভিন্নতা সূচিত হইতেছে।

এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলায় স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই ; ইহারা একই লীলা-প্রবাহের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অংশমাত্র ; উভয় লীলার সমবায়েই রসিক-শেখরের লীলার পূর্ণতা।

নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলা একই সূত্রে গ্রথিত ; সুতরাং একটীকে ছাড়িতে গেলেই সমগ্র লীলার সৌন্দর্য্যের এবং উপভোগ্যত্বের হানি হয়। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজ-লীলাই আস্বাদন করিয়া থাকেন ; সুতরাং ব্রজলীলাই নবদ্বীপ-লীলার উপজীব্য বা পোষক ; তাই ব্রজলীলা বাদ দিলে নবদ্বীপ-লীলাই অনেকাংশে শুষ্ক হইয়া পড়িতে পারে। আবার নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ দিলেও ব্রজলীলার মাধুর্য্যবৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। মধু স্বতঃই আস্বাদ্য সত্য ; কিন্তু ঘনীভূত অমৃতময় ভাণ্ডে ঢালিয়া যদি মধু আস্বাদন করা যায়, তাহাহইলে অবশ্যই তাহার মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশায়ীভাবে বর্দ্ধিত হয় ; আর তাহার সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের উন্মাদনাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। ব্রজলীলা মধুস্বরূপ, আর নবদ্বীপ-লীলা যেন কর্পূরমিশ্রিত ঘনীভূত অমৃত-ভাণ্ড। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মাধুর্য্যমূর্ত্তি ; তিনিই নবদ্বীপ-লীলায় ব্রজরসের পরিবেশক। রস ঘরে থাকিলেই তাহার আস্বাদন পাওয়া যায় না ; পরিবেশকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের উপরেই আস্বাদনের বিচিত্রতা নির্ভর করে। রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মত পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্যত্র দুর্লভ। তাই নবদ্বীপ-লীলা বাদ দিলে ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনাও ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। ব্রজলীলারূপ অমূল্য রত্ন নবদ্বীপ-লীলারূপ সমুদ্রেই পাওয়া যায়।

কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে গৌরাঙ্গ-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২৫।২২৩

শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।

এ-সমস্ত কারণে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-লীলা এবং শ্রীশ্রীব্রজলীলা—উভয়ই তুল্যভাবে ভজনীয়; উভয়-লীলার সেবাই সাধকের তুল্যভাবে কাম্য। একথাই শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" উভয় লীলার আস্বাদনে এবং উভয়-লীলার সেবাতেই রসিক-শেখরের রসময়ী লীলার পূর্ণতম আস্বাদন এবং পূর্ণতম সেবা।

গৌরের উপাস্যত্ব

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকেই বর্ত্তমান্ কলির উপাস্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

করুণাই হইতেছে ভজনীয় গুণসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। গৌর-সুন্দরে করুণার এমনি বিকাশ যে, ভজন-সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়াও তিনি নির্ব্বিচারে আপামর-সাধারণকে ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম

দিয়া গিয়াছেন। অপর কোনও লীলায় এইরূপ করুণার অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয় না।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গৌরের করুণায় উদ্ধার লাভ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের জীবের জন্যও প্রভুর করুণার অভাব ছিল না। পরবর্ত্তী কালের লোকের জন্যই তিনি ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং ভজন-প্রণালীও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার লীলা অন্তর্হিত করিয়াছেন বটে ; কিন্তু যাঁহারা তাঁহারই প্রদর্শিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাঁহারই প্রচারিত পন্থায় ভজন করিবেন, অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডার লইয়া তাঁহাদের জন্য তিনি এখনও অপেক্ষা করিতেছেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—সাযুজ্যকামীর জ্ঞানমার্গের সাধনে যে মুক্তিলাভ, তাহাও বরং সুলভ ; কর্ম্মমার্গের অনুসরণে ভুক্তিকামী যে ইহকালের সুখ-সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদিসুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহাও বরং সুলভ। কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি (প্রেমভক্তি) সুদুর্ল্লভা।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তি র্ভুক্তি র্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥
—ভ, র, সি, ১।১।২৩

এই সুদুর্ল্লভত্ব দুই রকমের—এক, কিছুতেই পাওয়া যায় না ; আর, পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে নহে—যে পর্য্যন্ত চিত্তে ইহকালের বা পরকালের সুখ-সম্পদের বাসনা বা মুক্তিবাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। অনাসঙ্গ-ভজনে (অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে ভজন করিলে) কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না। আর, সাসঙ্গ-ভাবে (সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিময় ভজনে, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত

থাকিয়া তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে—এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিয়া) ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূরীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবার বাসনা উৎকণ্ঠাময়ী হইয়া উঠিবে, তখনই হরিভক্তি (প্রেমভক্তি) পাওয়া যাইতে পারে।

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা স্যাৎ সা সুদুর্ল্লভা॥
—ভ, র, সি, ১।১।২২

শ্রীমন্মহাপ্রভু এতাদৃশী সুদুর্ল্লভা প্রেমভক্তি নির্ব্বিচারে সকলকে দান করিয়াছেন।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত আনের কা কথা॥
—শ্রীচৈ, চ, ১।৮।১৭

আর, অন্তর্দ্ধানের পরেও এতাদৃশী সুদুর্ল্লভা প্রেমভক্তি দানের জন্য প্রভু যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন (ভজনের আদর্শ-স্থাপন এবং ভজন-প্রণালীর প্রচার দ্বারাই প্রেমভক্তিদানের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা সূচিত হইতেছে)।

করুণার এমন অপূর্ব্ব বিকাশ যাঁহার মধ্যে, তিনি যে ভজনীয় গুণের নিধি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(মহাপ্রভুর করুণার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য লেখকের "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য"-নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

সম্ভবামি যুগে যুগে

(১)

অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—শ্রীগীতা॥ ৪।৭-৮

—হে ভারত! যখন-যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, (তখন) তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

এস্থলে "যদা যদাহি"-বাক্য হইতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—সাধুদিগের পরিত্রাণাদির নিমিত্ত ভগবান্ যখন-তখনই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; তাঁহার অবতরণের সময় এবং বার-সংখ্যাসম্বন্ধে কোনও নিয়ম নাই। শ্রীপাদ রামানুজ তাহা স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন—"যদা যদাহীতি। ন কালনিয়মঃ অস্মৎসম্ভবস্য—(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আমার অবতরণের কোনও কাল-নিয়ম নাই। গীতা ৪।৭-শ্লোকের টীকা।" আবার "যুগে যুগে"-শব্দদ্বয়ের অর্থেও তিনি লিখিয়াছেন—"যুগে যুগে সম্ভবামি কৃতত্রেতাদিযুগেষু বিশেষনিয়মোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ।—আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, সত্যত্রেতাদিযুগে—এইরূপ বিশেষ নিয়মও নাই।" কিন্তু এসম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা দেখা যাউক।

ভগবান্ তিনরূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন—স্বয়ংরূপে, লীলাবতার-রূপে এবং যুগাবতাররূপে।

স্বয়ংরূপের অবতরণ-সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার॥

—শ্রীচৈ. চ, ১।৩।৪

ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে থাকে মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮,০০০০ বৎসর, বিষ্ণুপুরাণের মতে মনুষ্যমানের ৪৩২,০০০০,০০০ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ একবার মাত্র অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, একবারের বেশী নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটীমাত্র অবতরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ংভগবানের অবতরণ-কালের যে কোনও নিয়ম নাই, তাহা শাস্ত্র হইতে জানা যায় না। ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে সহস্র-চতুর্যুগ থাকে, তাহার মধ্যে কোনও এক দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন—এইরূপ নিয়মই দৃষ্ট হয়।

লীলাবতারগণের অবতরণের বিবরণও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে (১ম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়)। তাহাতে কোনও লীলাবতারের একাধিক বার অবতরণের কথা বলা হয় নাই; একবার করিয়া অবতরণের উল্লেখই করা হইয়াছে। সুতরাং লীলাবতারগণ যে যখন-তখনই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—শাস্ত্র হইতে তাহাও জানা যায় না।

লীলাবতার আবার কলিকালে অবতীর্ণ হয়েন না; এইরূপ এক নিয়ম বরং দৃষ্ট হয়।

কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহে তার নাম॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।৬।৯৭

তারপর যুগাবতার। চারিযুগের জন্য চারিজন যুগাবতার আছেন। সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম (শুকপত্রাভ-বর্ণ) এবং কলিতে

কৃষ্ণ (স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ নহেন, তাঁহার অংশ)। একযুগের যুগাবতার অপর কোনও যুগে অবতীর্ণ হয়েন না। যিনি যেই যুগের যুগাবতার, তিনি কেবল সেই যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্যই কোন্ যুগের যুগাবতার কে, তাহা নির্দ্ধারিত আছে। কোনও যুগাবতার যে তাঁহার নিজস্ব যুগে একাধিক বার অবতীর্ণ হয়েন, শাস্ত্রে তাহারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং যুগাবতারদের অবতরণ-সম্বন্ধেও যে সময়ের কোনও নিয়ম নাই, তাহাও বলা সঙ্গত হয় না।

বরং কোন্ সময়ে যুগাবতার অবতীর্ণ হয়েন না, তাহার একটা নিয়ম দেখা যায়। যে যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার আর পৃথক্ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না, স্বয়ংভগবানের মধ্যেই তিনি থাকেন এবং স্বয়ংভগবানের মধ্যে থাকিয়াই স্বয়ংভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা যুগাবতার নিজস্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সেই যুগে যুগাবতারের অবতরণ-সময়েই স্বয়ংভগবানও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৮

পৃথিবীর ভার-হরণ যুগাবতাররূপে জগতের পালন-কর্ত্তা (ক্ষীরোদ-শায়ী গুণাবতার) বিষ্ণুরই কার্য্য।

স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত পালন॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৭

ভার-হরণ স্বয়ংভগবানের কার্য্য হইলে প্রতিযুগেই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইত, যুগাবতারের কোনও প্রয়োজন হইত না।

এইরূপে যুগাবতারদের অবতরণের নিয়মও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাঁহারাও যখন-তখন অবতীর্ণ হয়েন না, একযুগে একাধিকবারও অবতীর্ণ হয়েন না। যেই যুগে স্বয়ংভগবানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগেও যুগাবতার পুনরায় পৃথক্ ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না।

অবশ্য যেই যুগে স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অন্য কোনও লীলাবতার অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতারও যথাসময়ে পৃথক্ ভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই যুগের যুগাবতার সেই লীলাবতারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন না। একমাত্র স্বয়ংভগবান্‌ই "নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ" বলিয়া তাঁহার মধ্যেই যুগাবতার থাকেন; অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই "নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ" নহেন।

যদি ভগবান্ যখন-তখনই অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে কেবল "যদা যদাহি"-ইত্যাদি বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষান্ত হইতেন, পুনরায় "সম্ভবামি যুগে যুগে" বলিতেন না। "যদা যদা হি"-বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহাই "সম্ভবামি যুগে যুগে"-বাক্যে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তিনি যে যখন-তখনই অবতীর্ণ হয়েন না, তাহাও এই বাক্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি "যুগে যুগে" অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। "সম্ভবামি যুগে যুগে"-বাক্যে "যদা যদা হি"-বাক্যের ব্যাপকতম অর্থ সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। এজন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ হনুমান, শ্রীপাদ মধুসূদন প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ লিখিয়াছেন—"যুগে যুগে প্রতিযুগম্।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যুগে যুগে প্রতিযুগং প্রতিকল্পং বা।" প্রতিকল্পম্-শব্দে স্বয়ংভগবানের অবতরণের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; তিনি এক কল্পে (ব্রহ্মার একদিনে) একবার অবতীর্ণ হয়েন। আর, শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী ও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"যুগে যুগে তত্তদবসরে, তত্তৎসময়ে।" এই সমস্ত ভাষ্যকারদের লিখিত

অর্থের তাৎপর্য্য এই—প্রতিযুগে ভগবান্ যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন, যখন-তখন অবতীর্ণ হয়েন না।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভগবান্ যখন-তখনই অবতীর্ণ হয়েন না। তাঁহার অবতরণের সময়াদি সম্বন্ধে তাঁহার স্বেচ্ছাধীন নিয়ম আছে। প্রতিযুগে যুগাবতাররূপে তিনি একবারই অবতীর্ণ হয়েন; স্বয়ংভগবান্‌রূপে এক কল্পে একবার অবতীর্ণ হয়েন এবং এক লীলাবতাররূপেও একবারের বেশী অবতীর্ণ হয়েন না। কলিতে লীলাবতাররূপেও অবতীর্ণ হয়েন না। আর যে যুগে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই যুগের যুগাবতার আর পৃথক্‌রূপে অবতীর্ণ হয়েন না।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ংভগবানের দুইবার অবতরণ তো দেখা যায়? একবার দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং আর একবার, সেই দ্বাপরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে শ্রীশ্রীগৌররূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েন।

ইহার উত্তর এই। যে উদ্দেশ্যে স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্যক্ পূর্ণতা পর্য্যন্তই তাঁহার লীলা-প্রবাহ চলিতে থাকে; নচেৎ তাঁহার অবতরণই সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করে না। স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন—রাগমার্গের ভক্তি-প্রবর্ত্তনের জন্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আরম্ভ দ্বাপরের ব্রজলীলায় এবং পূর্ণতা কলির নবদ্বীপ-লীলায়। দ্বাপর-লীলাতে এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যেটুকু অপূর্ণ থাকে, তাহা যে দ্বাপর-লীলায় পূর্ণ হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি যে তাহা পূর্ণ করিতে পারেন না, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভক্তভাবময়ী লীলা না হইলে তাহা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর-লীলা ভক্তভাবময়ী নহে; তাঁহার গৌররূপের

নবদ্বীপ-লীলাই ভক্তভাবময়ী। তাই গৌররূপের লীলাতেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পূর্ণতা সম্ভব।

একই লীলাতে ভক্তভাব ও ভগবদ্‌ভাব সম্ভব নয়; তাহাতে লীলার নিত্যত্ব থাকে না, স্বরূপগত ভাবেরও নিত্যত্ব থাকে না। তাই তাঁহাকে দুই রূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং দুই ভাবের লীলাও প্রকটিত করিতে হইয়াছে। তাহা না করিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পূর্ণতা হইত না।

দুই রূপে অবতরণের সময়ের পার্থক্যও বেশী নয়। শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন দ্বাপরের শেষে।

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

—শ্রীচৈ, চ, ১৷৩৷৮

আর, গৌররূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেই চতুর্যুগেরই অন্তর্গত কলির প্রথম সন্ধ্যায়।

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

—শ্রীচৈ, চ, ১৷৩৷২২

দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীগৌররূপে স্বয়ংভগবান্ রাগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককারিণী একই লীলার প্রকটন করিয়াছেন। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহার দুইবার অবতরণ মনে হইলেও লীলাপ্রবাহের, এবং লীলাপ্রকটনের উদ্দেশ্যের, অভিন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই; তাই দ্বাপর-লীলা ও কলি-লীলাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন দুইটি পৃথক্ লীলা বলা যায় না। একই লীলা-প্রবাহ, মধ্যে সামান্য একটু বিরাম মাত্র। দ্বাপরে, ব্রজে কিছুকাল লীলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় এবং দ্বারকায় লীলা করিয়াছেন; তখন প্রকট-ব্রজলীলার বিরাম। দন্তবক্র-বধের

পরে আবার ব্রজে আসিয়াছেন, কিছুকাল লীলাও করিয়াছেন। মধ্যের বিরামে ব্রজলীলার স্বরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং বিরামের পূর্ব্বের এবং পরের লীলাকেও দুইটী পৃথক্ লীলা বলা হয় না। তদ্রূপ, দ্বাপর-লীলা এবং নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে কিছু সময়ের জন্য যে বিরাম দেখা যায়, তাহাতেও লীলার উদ্দেশ্যের স্বরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই; তাই এই দুইটিকে পৃথক্ লীলাও বলা যায় না। ব্রজের লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দিয়াশিনী নাপিতানী ইত্যাদি স্বরূপ সময়-বিশেষে প্রকটিত করিয়াছেন। তাহাতেও লীলার স্বরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ভিন্নতাও প্রকটিত হয় নাই। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং শ্রীগৌরস্বরূপের আবির্ভাবেও লীলার ভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় না। লীলা যখন এক, লীলার উদ্দেশ্যও যখন এক, তখন কিঞ্চিৎ বিরাম-সত্ত্বেও উভয় ধামের লীলায় ভগবানের অবতরণকে একই অবতরণ বলা যায়। দুইটি পৃথক্ অবতরণ বলা সঙ্গত হয় না। বরং নবদ্বীপলীলাকে ব্রজলীলার পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। পরিশিষ্ট এবং মূলগ্রন্থ একই এবং অভিন্নই।

একটী নাটকে একাধিক দৃশ্য থাকে। দুই-দুইটী দৃশ্যের মধ্যে অভিনয়ের বিরামও থাকে। তাহাতেও নাটকটীকে এক এবং অভিন্ন নাটকই বলা হয়। নাটকের যিনি নায়ক, তিনিও বিভিন্ন দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও অবতরণ করেন। তথাপি বলা হয়—অমুক নাটকে নায়করূপে অমুক অবতরণ করিয়াছেন। বিভিন্ন দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহার অবতরণ হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাঁহার এক অবতরণই মনে করা হয়। স্বয়ং ভগবানের লীলানাট্যে অবতরণও তদ্রূপ। এই নাটকের যেন দুইটী দৃশ্য—একটীতে ব্রজলীলা এবং আর একটীতে নবদ্বীপলীলা। সামগ্রিক দৃষ্টিতে একই লীলানাট্য। নায়ক—স্বয়ংভগবান্। তিনি দুই দৃশ্যে দুইভাবে অবতীর্ণ হয়েন।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাঁহারও একই অবতরণ। দুইটী দৃশ্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান—মনুষ্যমানে হাজার পাঁচেক বৎসর। কিন্তু ব্রহ্মার দিনের মানে ইহা অতি নগণ্য।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল, ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের একটা নিয়ম আছে। স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মার একদিনে মাত্র একবারই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটী উক্তি হইতে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়—এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। বস্তুতঃ যে কোনও ব্যতিক্রম নাই, শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিটীর আলোচনাদ্বারা তাহা দেখান হইতেছে।

(২)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন, তখন শ্রীমন্-নিত্যানন্দের নিকটে সেই সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের অভিপ্রায় অনুসারে প্রভু তাঁহার পার্ষদ ভক্তদের নিকটেও নিজের সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। শুনিয়া সকলেই বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের চিত্তে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রভু তাঁহাদের নিকটে একটী গূঢ় রহস্যের কথা প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন—"তোমরা দুঃখিত হইও না; আমি তোমাদিগকে ছাড়িবনা, ছাড়িতে পারিবওনা। যেহেতু—

সর্ব্বকাল তোমরা সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্মজন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে॥

এইমত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইবে আমার॥
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥
লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥"

—শ্রীচৈ, ভা, মধ্য ২৬ অঃ

লোক-পরম্পরা প্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া শ্রীশচীমাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রভু তাঁহার নিকটেও এক "গোপ্য কথা" প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন—"মা, কেবল এই জন্মেই আমি তোমার সন্তান নহি; জন্মে জন্মে তুমিই আমার মাতা। কোনও সময়ে তুমি ছিলে পৃশ্নি; তখনও তুমি আমার মাতা ছিলে। তার পরে তুমি স্বর্গলোকে ছিলে অদিতি, আমি ছিলাম বামনরূপে তোমার সন্তান। তার পরে তুমি হইলে দেবহূতি; তখনও আমি তোমার সন্তান; তখন আমার নাম ছিল কপিল। তারপর তুমি হইলে কৌশল্যা, আমি ছিলাম তোমার সন্তান রামচন্দ্র। তারপর তুমি মথুরাতে দেবকী ছিলে, কংস-কারাগারে আবদ্ধ ছিলে; তখনও আমি তোমার সন্তান ছিলাম। আরও বলি শুন মা—

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥
অমায়ায় এই সব কইলাঙ কথা।
আর তুমি মনে দুঃখ না পাও সর্ব্বথা॥

—শ্রীচৈ, ভা, মধ্য ২৬শ অঃ

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের—"এই মত আছে আর দুই অবতার" এবং "আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"—এই উক্তি দুইটীর মর্ম্ম সহজবোধ্য নহে। প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন—"এই দুই অবতারের আসন অধিকার করিবার জন্য বর্ত্তমানে অনেকেরই একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভুই জানেন, এই দুই অবতার কে?"

যাহা হউক, শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের চরণ স্মরণ করিয়া এই উক্তি দুইটী সম্বন্ধে একটু আলোচনার চেষ্টা করা হইতেছে।

আগামী দুই অবতারে মহাপ্রভু কোন্ স্বরূপে অবতীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়াছেন, প্রথমে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। শচীমাতার নিকটে তিনি বলিয়াছেন—উভয় অবতারেই তিনি "সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে" জন্মলীলা প্রকটিত করিবেন। পূর্ব্বে তিনি যে যে স্বরূপে শচীগর্ভকে উপলক্ষ্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া শচীমাতার নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন—পৃশ্নিগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবকী-পুত্র পর্য্যন্ত—তাঁহাদের কোনও স্বরূপই "সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে" অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কেবলমাত্র গৌরসুন্দররূপেই তিনি "সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে" জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং শচীমাতার নিকটে প্রভুর উক্তি হইতে মনে হয়—আগামী দুই অবতারেও তিনি শ্রীগৌরসুন্দর-রূপেই অবতীর্ণ হইবেন। ইহাই যে প্রভুর উক্তির অভিপ্রায়, তাঁহার পার্ষদ-ভক্তদের নিকটে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায়। তাঁহাদের নিকটে তিনি বলিয়াছেন—

এই মত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইবে আমার॥

তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥
—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পয়ার দ্রষ্টব্য।

প্রভু স্পষ্ট কথাতেই বলিয়াছেন—"এই মত আছে আর দুই অবতার।" এইমত—এক্ষণে নবদ্বীপে যেরূপ, ঠিক সেইরূপ দুই অবতার। সেই দুই অবতারেও—বর্ত্তমান কলিতে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়াছেন,—তাঁহারাই প্রভুর সঙ্গে ঠিক এইরূপ ভাবেই কীর্ত্তন করিবেন। আরও দুইবার যে তিনি নবদ্বীপ-লীলাই প্রকটিত করিবেন, তাহাই প্রভু বলিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখনই সপার্ষদে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপও তখনই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, সেই ধামেই তিনি লীলা করিয়া থাকেন।

ইহাতে স্পষ্টই জানা গেল—বর্ত্তমান কলিতে তিনি যে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, ঠিক সেই লীলাই তিনি আরও দুইবার প্রকটিত করিবেন—ইহাই প্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য।

ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্বীয় নিত্য-পরিকরবর্গকে লইয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নিত্য-পরিকরদের প্রত্যেকেরই স্বরূপগত ভাব এবং নামও নিত্য; সুতরাং বর্ত্তমান কলির অবতারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেমন শচী-জগন্নাথের যোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আগামী অবতার-সমূহেও তেমনি শচী-জগন্নাথের যোগেই অবতীর্ণ হইবেন এবং বর্ত্তমান কলির পরিকরদের ন্যায় আগামী অবতার-সমূহেও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দাদিই তাঁহার পরিকর থাকিবেন এবং তাঁহাদের নামও বর্ত্তমান কলির অবতার-সময়ের নামই থাকিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও তাহা যেন পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। তাঁহার পার্ষদভক্তদের সান্ত্বনার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই

উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাতে প্রভু বলিয়াছেন—"এই জন্মেই (অবতারেই) যে তোমরা সকলে আমার সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গী, তাহা নহে; তোমরা আমার সর্ব্বকালের সঙ্গী; তোমরা নিরবধিই আমার সঙ্গে "সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে" বিরাজিত। এই অবতারের ন্যায় আরও আমার দুইটী অবতার হইবে; তাহাতেও তোমরা এই অবতারের মতনই "কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥" এস্থলে প্রভু স্পষ্ট কথাতেই বলিলেন—যাঁহাদের নিকটে তিনি এ-সকল কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপের নিত্য পার্ষদ; সুতরাং প্রভুর সকল অবতারেই তাঁহাদের নাম-রূপ-ভাবাদি একই রকম থাকে। আর শচীমাতাকেও বলিয়াছেন —"সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে আরও দুইবার আমি তোমার পুত্র হইব।" সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে একমাত্র শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপেরই আবির্ভাব হয় এবং শ্রীশ্রীশচীমাতার যোগেই তাঁহার আবির্ভাব হয়—সকল অবতারে। এস্থলেও প্রভু শচীমাতাকে জানাইলেন—আগামী দুই অবতারেও তাঁহার নাম হইবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং মাতার নাম হইবে শ্রীশ্রীশচীদেবী।

প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর উক্তি অনুসারে, যাঁহারা মহাপ্রভুর কথিত দুই অবতারের আসন গ্রহণ করার জন্য আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও উল্লিখিত লক্ষণগুলি আছে কিনা, তাহাও বিবেচ্য।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে আরও দুই বার সপরিকরে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন্ সময়ে? সময় সম্বন্ধে প্রভু কিছু বলেন নাই। বলার প্রয়োজনও ছিল না; কেননা, তাঁহার অবতরণের সময় শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।

শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ংভগবান্ একবারই অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও স্বয়ংভগবান্; সুতরাং তিনিও ব্রহ্মার এক

দিনে মাত্র একবারই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান কলিতে যখন তিনি একবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন বর্ত্তমান কলি ব্রহ্মার যেই দিনের অন্তর্ভুক্ত, সেই দিনের মধ্যে যে তিনি আর অবতীর্ণ হইবেন না, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ব্রহ্মার বর্ত্তমান দিন শেষ হইতে মনুষ্যমানের আর কত বৎসর বাকী আছে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে থাকে এক হাজার সত্যযুগ, এক হাজার ত্রেতাযুগ, এক হাজার দ্বাপর যুগ এবং এক হাজার কলিযুগ। মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর ; ইহাদের সমষ্টি হইল একটী চতুর্যুগের পরিমাণ—৪৩২,০০০০ বৎসর। এইরূপ এক হাজারটী চতুর্যুগের পরিমাণ হইবে—৪৩২,০০০০,০০০ বৎসর এবং ইহাই হইতেছে মনুষ্যমানে ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ—চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসর।

ব্রহ্মার একটী দিনের মধ্যে থাকে চৌদ্দটী মন্বন্তর ; মন্বন্তর হইতেছে একজন মনুর রাজত্বকাল। বর্ত্তমানে সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে। এই বৈবস্বত মন্বন্তর শেষ হইয়া গেলেও ব্রহ্মার বর্ত্তমান দিনের মধ্যে আরও সাতটী মন্বন্তর বাকী থাকিবে। একটী মন্বন্তরের মধ্যে থাকে একাত্তরটী চতুর্যুগ—অর্থাৎ মনুষ্যমানে ৭১ × ৪৩২,০০০০ বৎসর বা ৩০৬৭২,০০০০ বৎসর।

বৈবস্বত মন্বন্তরের একাত্তর চতুর্যুগের মধ্যে বর্ত্তমানে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে কলির ৫০৫৪ বৎসর গত হইয়াছে, আরও ৪২৬৯৪৬ বৎসর বাকী। সুতরাং এখন হইতে ৪২৬৯৪৬ বৎসর পরে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ শেষ হইবে। তাহার

পরেও তেতাল্লিশটী চতুর্যুগ বা ৪৩×৪৩২,০০০০ বৎসর, অর্থাৎ ১৮৫৭৬,০০০০ বৎসর বাকী থাকিবে। ইহার সঙ্গে বর্ত্তমান কলির স্থিতাব্দ ৪২৬৯৪৬ বৎসর যোগ করিলে মোট হইবে—

১৮৫৭৬,০০০০+৪২৬৯৪৬=১৮৬১৮,৬৯৪৬। অর্থাৎ ব্রহ্মার বর্ত্তমান দিনের আরও বাকী আছে—মনুষ্যমানে ১৮৬১৮,৬৯৪৬ বৎসর বা সাড়ে আঠারকোটী বৎসরেরও বেশী। এই সময়ের মধ্যে শাস্ত্রানুসারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পুনরায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ব্রহ্মার এই দিনটি শেষ হইয়া গেলে আবার একটী নূতন দিন—মনুষ্যমানের চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসরের একটী দিন—আরম্ভ হইবে; সেই দিনে একবার এবং তাহার পরবর্ত্তী সেই পরিমাণ আর একটী দিনে একবার—এই দুইবার প্রভু যথানিয়মে অবতীর্ণ হইবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে শাস্ত্রোক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনেই তো শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর একবার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কেবল দুইবার অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হইল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এইরূপ। মনুষ্যমানে চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসরে ব্রহ্মার একদিন হয়; এইরূপ তিনশত ষাটি দিনে তাঁহার এক বৎসর; এইরূপ একশত বৎসর তাঁহার আয়ুষ্কাল এবং ইহাই মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসত্যাগের সময়। এই একশত বৎসর পূর্ণ হইলেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, মহাপ্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রভুর উক্তি হইতে অনুমিত হয়—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইতে বর্ত্তমান দিন ব্যতীত আর মাত্র দুইটি দিন বাকী আছে। তাহার পরেই মহাপ্রলয় আরম্ভ হইবে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর আর মাত্র দুইবার অবতীর্ণ হইবেন এবং আর দুইবার অবতরণের

পরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে—ইহাই বোধ হয় প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন। কিন্তু তাহাও বর্ত্তমান সময় হইতে মনুষ্যমানে কিঞ্চিন্ন্যূন নয় শত কোটী বৎসর পরে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—বর্ত্তমান সময় হইতে সাড়ে আঠার কোটি বৎসর অপেক্ষাও অধিককাল পরে ব্রহ্মার যে দিন আরম্ভ হইবে, সেই দিনেই যদি প্রভু-কথিত দুইবারের মধ্যে প্রথম বার অবতীর্ণ হওয়ার কথাই তিনি বলিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে কেন তিনি বলিলেন—"হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।"—"অবিলম্বে" বলিলেন কেন? আঠার বা বিশ কোটী বৎসরের ব্যবধানটাকে কি "অবিলম্বে" বলা সঙ্গত হয়?

উত্তর বোধ হয় এই। মনুষ্যমানে আঠার বা বিশ কোটী বৎসর হইলেও ব্রহ্মার দিনের মানে ইহাকে নগণ্য বলা অসঙ্গত হইবে না। আগামী কল্য বা পরশ্ব যে ঘটনা ঘটিবে, অদ্য যদি বলা হয়—সেই ঘটনা অবিলম্বেই ঘটিবে—তাহা হইলে অসঙ্গত হইবে না। যে সময়ে মহাপ্রভু ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন, সেই সময়টি হইতেছে ব্রহ্মার বর্ত্তমান দিনের মধ্যে—ব্রহ্মার "অদ্য-কার" দিনে। ব্রহ্মার "আগামী কল্য এবং পরশ্ব দিনে" যাহা ঘটিবে, তাহাকে অদ্যকার দিনে "অবিলম্বে" ঘটিবে বলা অন্যায় হয় না। প্রভুর উক্তির ধ্বনি হইতেও তাহা বুঝা যায়। দুইটী বিভিন্ন অবতার তো যুগপৎ—একই সময়ে হইতে পারে না; একটীর পরেই আর একটী হইবে—একটীর বহু বৎসর পরে আর একটী। তথাপি কিন্তু প্রভু দুইটী অবতারই "অবিলম্বে" ঘটিবে বলিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দুইটী অবতারের মধ্যবর্ত্তী সময়টি মনুষ্যমানে কোটী-কোটী বৎসর হইলেও ব্রহ্মার দিনের মানে তাহা নগণ্য এবং উক্ত কথা বলার সময় হইতে মনুষ্যমানে যত বৎসর পরে প্রথম অবতারটী ঘটিবে, তাহাও

নগণ্য। এইরূপ মনে না করিলে শাস্ত্রোক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না। মহাপ্রলয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইতে এবং সেই সৃষ্টিকালে স্বয়ংভগবানের অবতরণ হইতে অনেক বিলম্ব; যেহেতু, মহাপ্রলয়ও মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস-গ্রহণের সময় (অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের সম-পরিমাণ সময়) ব্যাপিয়াই চলিতে থাকে।

যদি কেহ বলেন—বর্ত্তমান কলিতেই প্রভু আরও দুইবার অবতীর্ণ হইবেন—ইহাই প্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য। কিন্তু ইহা যে বিচারসহ নহে, তাহার হেতু এই। প্রথমতঃ, শাস্ত্র হইতে জানা যায়, যেই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীশ্রীগৌর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন না, তাহার পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীশ্রীগৌর অবতীর্ণ হয়েন না, শ্রীকৃষ্ণাবতারের অপেক্ষা না রাখিয়াও কখনও তিনি অবতীর্ণ হয়েন না। এই কলিতে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া। যদি এই কলিতেই তাঁহাকে আরও দুইবার অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণও এই কলিতে, মহাপ্রভুর পূর্ব্বে, অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন, কোনও কলিতে তাঁহার অবতরণের কথা শুনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, দ্বাপর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-কর্ত্তৃক জগতে রাগধর্ম্ম-প্রচারের যে অংশ অপূর্ণ থাকে, সেই অংশের পূরণের (অর্থাৎ প্রেমদানের) জন্যই স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং প্রেমদান-কার্য্য পূর্ণ হইয়া গেলে তিনি অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্ত হয়েন। এই কলিতেও প্রেমদানের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই প্রেমদানের কার্য্য সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জগদানন্দপণ্ডিতের যোগে তর্জ্জা পাঠাইয়া প্রভুকে জানাইয়াছেন।

বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৯।১৯-২০

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের জিজ্ঞাসায়, প্রভু ভঙ্গীতে এই তর্জ্জার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা-লাগি দেবের করে আরাধন।
পূজা লাগি কিছুকাল করে নিরোধন॥
পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।

—শ্রীচৈ, চ, ৩।১৯।২৪-২৬

প্রভু ভঙ্গীতে জানাইলেন—"জগতে প্রেম-বিতরণের উদ্দেশ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। যতকাল প্রেম-বিতরণের কাজ চলিতেছিল, ততকাল আমাকে এই জগতে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সকল লোকই প্রেম পাইয়াছে, প্রেম পাওয়ার বাকী আর কেহ নাই। তাই এখন তিনি আমাকে বিসর্জ্জন করিতেছেন—জানাইয়াছেন—এখন আমি অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি।"

প্রভুর এই উক্তি শুনিয়া, প্রভুর অন্তর্দ্ধানের আশঙ্কা করিয়া "স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১৯।২৮॥" তর্জ্জাপ্রাপ্তির পর হইতেই প্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।১১।২৯

প্রকট-লীলায় প্রভুর দুইটী কাজ—প্রেম-বিতরণ এবং শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন। শেষোক্ত কার্য্যটী প্রকটে এবং অপ্রকটে সমান ভাবেই চলে। কেবল প্রেমদানের জন্যই লীলা প্রকটিত করা; মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য নহে; যেহেতু, ইহা অপ্রকটেও চলিতে পারে। এক্ষণে প্রকটত্বের জীবসম্বন্ধীয় মুখ্য কার্য্য প্রেমবিতরণ পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় প্রভু কেবল স্বমাধুর্য্য-আস্বাদনেই নিবিষ্ট হইলেন এবং লীলা অপ্রকট করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট হইলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—প্রকট থাকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যাওয়ার পরেই তিনি অপ্রকট হইয়াছেন। পুনরায় আবার কিসের জন্য এই কলিতেই তিনি অবতীর্ণ হইবেন?

যদি বলা যায়—যাহারা প্রভুর প্রকট-কালে জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়া প্রেম পায় নাই, তাদের জন্য তিনি আবার অবতীর্ণ হইতে পারেন। তাহারও প্রয়োজন প্রভু রাখিয়া'যায়েন নাই। তাহাদের জন্যই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের যোগে প্রভু বিস্তৃত ভজন-প্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুসরণে ভজন করিলে প্রভু তাহাদিগকেও প্রেম দিবেন—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। সুতরাং পরবর্ত্তী কালের লোকের জন্যও এই কলিতেই প্রভুর পুনরায় অবতরণের কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বকল্পে মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন এবং ভজন-প্রণালীও রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পরে এবং এইবার অবতরণের পূর্ব্বে যে আর প্রেমভক্তি বিতরণ করেন নাই—সুতরাং অবতীর্ণও হয়েন নাই—স্বয়ংভগবানের নিজের উক্তিতেই তাহা জানা যায়—

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।১২

পূর্ব্বকল্পে প্রচারিত ভজন-প্রণালীও যে কালবশে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার পুনঃ-প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই যে প্রভু এইবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

—কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় (অপ্রচলিত) স্ববিষয়ক-ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণ-কমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।

পূর্ব্বকল্পের অবতার এবং বর্ত্তমান কলির অবতার—ইহাদের মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যমানে অতি সুদীর্ঘকালের মধ্যেও প্রভু যখন অবতীর্ণ হয়েন নাই, তখন এই কলিতেই তাঁহার আরও দুইবার অবতরণের কল্পনা যুক্তিসঙ্গতও নয়, শাস্ত্রসম্মতও নয়।

যাহারা মহাপ্রভুর প্রকটকালে বর্ত্তমান থাকে, বা জন্মগ্রহণ করে, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই নির্ব্বিচারে প্রেমদান করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েন। ভজন-সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নির্ব্বিচারে যে কোনও সময়ের লোককে প্রেমদান করাই যদি প্রভুর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে নিত্যকালই তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকিতে হইত; কোনও সময়েই তাঁহার অন্তর্দ্ধান সম্ভব হইত না; কেন না, একবার তিনি

অন্তর্দ্ধানপ্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল পরে আবার আবির্ভূত হইলে অন্তর্দ্ধান ও আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তীকালে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া মরিয়াও যাইবে, তাহারা প্রেমলাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। বস্তুতঃ, প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তীকালে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, প্রেমপ্রাপ্তির জন্য তাহাদিগের পক্ষে ভজনই একমাত্র উপায়; এজন্যই মহাপ্রভু ভজন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি যে বর্ত্তমান কলিতে এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কল্পেও তাঁহার লীলার আবির্ভাব এবং তিরোভাব করাইয়াছেন, তাহাদ্বারাও উল্লিখিত-রূপ বিধানের কথাই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

সুতরাং ১৪৫৫ শকে প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য তিনি আবার অবতীর্ণ হইতে পারেন—এইরূপ অনুমান বা যুক্তি বিচারসহ নহে।

যাহা হউক, এই সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্র-প্রমাণের ব্যতিক্রম নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত ইহার সঙ্গতি আছে।

———

নাম-সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম-উপায় ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।৭ ॥"

নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে পরম-উপায় বলার একটা হেতু প্রভুর উক্তি হইতেই জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।৪।৬৫-৬৬

নাম-নামী অভিন্ন বলিয়াই নামের এত মহিমা। অন্য কোনও ভজনাঙ্গ নামীর সঙ্গে অভিন্ন নহে।

মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—"নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৫।১০৮ ॥" এই উক্তির ধ্বনি এই যে, নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেও নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে; নচেৎ, সেই অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকিবে।

নাম-সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের আরও হেতু এই যে, সাধক-সমাজে যত রকম সাধন-পন্থা প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর উপরেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যাপ্তি আছে। এই ব্যাপ্তি দুই রকমের—আনুষঙ্গিকভাবে সাহচর্য্যদানরূপে ব্যাপ্তি এবং স্বতন্ত্ররূপে ব্যাপ্তি।

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-মার্গের সাধনে সাহচর্য্যদানরূপে ব্যাপ্তি। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১৪ ॥" ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান-মার্গের সাধন স্ব-স্ব-ফল-প্রদানে অসমর্থ।

সুতরাং কর্ম্মমার্গে, যোগমার্গে ও জ্ঞান-মার্গে সাধনের সহায়-কারিণীরূপে ভক্তির ব্যাপ্তি আছে। আবার ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কর্ম্ম-যোগাদিতে সহায়-কারিরূপে নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরও ব্যাপ্তি আছে।

স্বতন্ত্ররূপে ব্যাপ্তি। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিমার্গে শাস্ত্রে যে সমস্ত সাধনাঙ্গের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, সে-সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া, স্বীয় অভীষ্টকে চিত্তে পোষণ করিয়া, যদি কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তনই করা হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন পন্থার সাধক স্বীয় অভীষ্ট ফল পাইতে পারেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন স্বতন্ত্রভাবেই সে-সমস্ত ফলদানে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

—শ্রীভা, ২।১।১১

—ফলাকাঙ্ক্ষী সকাম ব্যক্তিদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তি-বিষয়ে (কর্ম্মমার্গ), নির্ব্বেদ-ভাবাপন্ন মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-প্রাপ্তি-বিষয়ে (জ্ঞানমার্গ), যোগীদিগের পরমাত্মার সহিত মিলন-প্রাপ্তি-বিষয়ে (যোগমার্গ)—কর্ম্মি-যোগি-জ্ঞানীদিগের স্ব-স্ব-অভীষ্ট-ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে—শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনই হইতেছে বিঘ্নাদির আশঙ্কাশূন্য একমাত্র নিরাপদ পন্থা। বরাহপুরাণ হইতেও জানা যায়—

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥

—শ্রীহ, ভ, বি ১১।২০৮ ধৃত-বচন

—ভগবান্ বলিতেছেন, হে ভূমি, যে ব্যক্তি—হে নারায়ণ, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে বাসুদেব—নিরন্তর এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি

আমার সহিত সাযুজ্যলাভ করিয়া থাকেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া সাধক বৈকুণ্ঠে বা বিষ্ণুলোকে পার্ষদত্বও লাভ করিতে পারেন। বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলেন—

জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্॥

—শ্রীহ, ভ, বি ১১।২২১ ধৃত-বচন

—যাঁহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি (সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি) লাভ হয় এবং তাঁহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—সকাম সাধকের ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত কেবলমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলেই পাওয়া যাইতে পারে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি হইল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমার্গের ফল। কিন্তু এই সমস্তই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র ফলও নহে, মুখ্য ফলও নহে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল হইতেছে—প্রেম, ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম, যাহার ফলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন এবং ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন।

যাঁহারা রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবাকামী, তাঁহারা সালোক্যাদি-মুক্তি কামনা করেন না, ভগবান্ নিজে উপযাচক হইয়া তাহা দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—শ্রীভা, ৩।২৯।১৩

তাঁহাদের একমাত্র কাম্য হইতেছে—প্রেম, যাহা হইতেছে কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার একমাত্র উপায়।

যে-কোনও রকমে নামের বা নামাভাসের উচ্চারণ করিলেই নিরপরাধ ব্যক্তির মুক্তিলাভ হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে প্রেমলাভ হয় না।

প্রেমলাভের জন্য কিরূপে নাম করিতে হইবে, তাহাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

নিম্নোদ্ধৃত পয়ার-সমূহে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।১৭-২১

প্রেম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নাম-কীর্ত্তন করিতে হইলে আরও দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ, সাসঙ্গ-ভাবে নাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের সাক্ষাতে উপস্থিতি চিন্তা করিয়া তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে

নাম-কীর্ত্তন করা হইতেছে—এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিতে হইবে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৫-৫৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়তঃ, নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্‌-ভাগবতের "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১১।২। ৪০ ॥"—এই শ্লোক হইতে জানা যায়, নাম-কীর্ত্তনকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেই প্রেম লাভ করা যায়।

যাহা অবিচলিত ভাবে নিত্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে ব্রত বলে। প্রতিদিন অবিচলিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক নাম গ্রহণ করিতে পারিলেই বলা যায়—নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নিয়ম ছিল—তিনি একমাসে এক কোটী নাম গ্রহণ করিতেন; অবিচলিত ভাবে তিনি তাহা করিয়াছেন। সংখ্যা-রক্ষণপূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন না করিলে ব্রতত্ব রক্ষিত হইতে পারে না—কোনও দিন কমও হইয়া যাইতে পারে। এজন্য প্রাচীন মহাজনগণ এমন কি, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও সংখ্যা-রক্ষণপূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

ব্রতরূপে গৃহীত সংখ্যা-নাম হরিনামের মালাতেই কীর্ত্তনীয়; নচেৎ সংখ্যা রাখার সুবিধা হয় না। ব্রতরূপে যে সংখ্যা গৃহীত হয়, কোনও দিন তাহার ন্যূনতা হইলে ব্রত-ভঙ্গ হইবে। অবশ্য অধিক হইলে ক্ষতি নাই; যেহেতু, সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তনেরই বিধি। সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তন সম্ভব হয় না বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যায় কীর্ত্তনের উপদেশ।

সংখ্যানাম পূর্ণ হইয়া গেলে, কিম্বা সংখ্যানামের অধিক হইয়া যাওয়ায় পরে অসংখ্যাত-নাম-কীর্ত্তনেও দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, শ্রীমনমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।১৪

"খাইতে শুইতে যথা-তথা" সংখ্যা রাখিয়া নাম করা সম্ভব হয় না। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে—অসংখ্যাত নাম অবিধেয় নয়।

কোনও বিশেষ নাম বা নাম-মালা যে অসংখ্যাত ভাবে কীর্ত্তন করা সঙ্গত নয়, এরূপ কথা কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও তাহা বলেন নাই। তবে ব্রতরূপে গৃহীত নাম সংখ্যা-রক্ষণপূর্ব্বকই কীর্ত্তনীয়—ইহা পূর্ব্বমহাজনগণ এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও—নিজেরা আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীরই ন্যায় নাম হইতেছেন স্বতন্ত্র—কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহেন। নাম হইতেছেন—স্বপ্রকাশ, কৃপা করিয়া ভাগ্যবানের জিহ্বাদিতে আত্ম-প্রকট করেন। মল-মূত্র-ত্যাগাদির সময়ে বা নিদ্রাকালে যদি নাম কাহারও জিহ্বায় আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন তো সংখ্যা রাখার প্রশ্নই উঠে না।

ভগবানের নাম-মাত্রই মহামন্ত্র। মহামন্ত্র-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, মন্ত্রের ন্যায় মহামন্ত্র বিধি-নিষেধের অপেক্ষা রাখেন না। এজন্যই নাম কখনও "দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে॥" এবং এজন্যই "খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম"-গ্রহণের বিধি। দীক্ষা-মন্ত্র কিন্তু দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যারও অপেক্ষা করেন, যে কোনও স্থানে যে কোনও অবস্থায় জপ্যও নহেন।

গৃহী বা সন্ন্যাসী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, বালক বা বৃদ্ধ—যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও অবস্থায় (অশুদ্ধি অবস্থাতেও) নাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। এজন্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি যার"।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণানুগত গোস্বামিপাদগণ আবার উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও উচ্চস্বরেই তারক-ব্রহ্ম নাম-কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল হরিদাসঠাকুরও একলক্ষ নাম উচ্চস্বরে গ্রহণ করিতেন বলিয়া শুনা যায়। (এ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয়-সংস্করণের ৩।২০।৭ পয়ারের গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে দ্রষ্টব্য)।

নাম পরম-মধুর, আনন্দ-সমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেয়; নামের প্রতিপদে, প্রতি অক্ষরে পূর্ণ-অমৃতের আস্বাদন পাওয়া যায়। মায়ামলিন-চিত্ত জীব কিন্তু নামের এই মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না। রসগোল্লা খুব আস্বাদ্য হইলেও জিহ্বার উপরে যদি একখণ্ড কলাপাতা রাখিয়া তাহার উপরে রসগোল্লা রাখা হয়, জিহ্বা তাহার স্বাদ পাইবে না। আমাদের জিহ্বাদিতেও দুর্ব্বাসনারূপ কলাপাতা আছে; তাই জিহ্বাদির সঙ্গে নামের স্পর্শ হইতে পারে না। নামেরই কৃপায় এই কলাপাতা দূরীভূত হইয়া গেলেই নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে। "চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনমিত্যাদি"-শ্লোকে মহাপ্রভু তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব এত অধিক যে, পূর্ণকাম এবং আনন্দস্বরূপ হইয়াও রসিক-শেখর ভগবান্ নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য লালায়িত। তাই তিনি বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" রাই-কানু-মিলিত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও যে নাম-মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য লালায়িত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৩-৪ পৃষ্ঠা)। এইজন্যই তাঁহার উপাসনার সর্ব্ব-প্রধান উপচারও হইতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন। "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ। শ্রীভা, ১১।৫।৩২॥"—নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃত-রস যে ভাগ্যবান্ তাঁহার নিকটে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, মদনমোহনরূপ

তাঁহাকে পরিবেশন করেন, তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অপেক্ষাও অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-চমৎকারিত্বময় স্বীয় রূপের মাধুর্য্য তাঁহাকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

উপসংহার

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চার যে শ্লোকটী লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর তত্ত্বসম্বন্ধে সেই শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যে সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রসম্মত, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা গিয়াছে।

শ্রীরাধার সহিত একত্ব-প্রাপ্তিবশতঃ-গৌরবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বিশেষ কলিতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক আপামর সাধারণকে প্রেম বিতরণ করেন, তাঁহার দর্শনেও যে লোক প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তাঁহারই ন্যায় প্রেমবিতরণের শক্তিলাভ করেন, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি যে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন—শাস্ত্রবাক্যের আলোচনায় তাহা পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিশেষ-কলিতে অবতীর্ণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেও যে ঐ সকল লক্ষণ বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার বিশেষ লক্ষণ এবং মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার বিশেষ লক্ষণও যে তাঁহাতে বিদ্যমান্—তাহাও দেখান হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ, শাস্ত্রবিশ্বাসীর নিকটে তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

"সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূর্ণিমা, ১৩৬০ সন

৫। স্বনামধন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ভক্তপ্রবর **শ্রীল হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন** (কুড়মিঠা, বীরভূম। ৫।৯।৬০ বাং)। "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" পাইয়া ধন্য হইলাম। * * শ্রীশ্রীগৌর-করুণার অকৃপণ ধারার অভিসেচনে আপনি ধন্য। * * শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, চির-নিরাময় করুন।

৬। **Amritabazar Patrika** (17.1.54). Sri Sri Gour-Karunar Vaishishtya * * * Every sentence in the book is to be read and reread. The book needs no commendation ; for, we think them to be lucky who get it and go through it in a spirit of profound reverence.

৭। শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী সুপণ্ডিত পরম ভাগবত **শ্রীল দীনশরণ দাস বাবাজীমহারাজ** (লোটনকুঞ্জ, বৃন্দাবন। ২৬।৯।৬০ বাং)। "শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

৮। পরমভাগবত **কুমার শ্রীল শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষরায়** প্রাজ্ঞ এম,এ, (১১, ব্রণফেল্ড রো, আলিপুর, কলিকাতা)। শ্রীপুস্তক পাইয়া মস্তকে ধারণ করিলাম। আপনি সুপণ্ডিত, সুলেখক, বৈষ্ণবাচার্য্য, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর * *। গ্রন্থ আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে।

৯। পরম ভাগবত শ্রীল জিতেন্দ্র নাথ বসু, গীতারত্ন, সলিসিটার। (৬৪, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ১৩।১০।৬০ বাং)। "গৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য" পাঠ করিয়া আমি আপনার * * চিরতরে বিক্রীত হইলাম। এরূপ উত্তম খাদ্য পূর্ব্বে কখনও আস্বাদন করি নাই। * * জীবন সার্থক হইল বলিয়া মনে হইতেছে। গতকল্য পুস্তকখানির প্রায় অর্দ্ধেক গীতা-সভায় পাঠ করা হইয়াছে। পাঠ-শ্রবণে অনেকেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ভাবে টল্‌মল্ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনার সাধনাকে সার্থক করুন।

লেখকের গ্রন্থাবলী

১। **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা-সম্বলিত তৃতীয় সংস্করণ ; ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত। ডবল ক্রাউন আট পেজী ফর্ম্মায় ৪,০০০ পৃষ্ঠার উপরে। মূল্য ৪৫৲ টাকা। রেজিষ্টারী বুকপোষ্টে ডাকমাশুলাদি ৭৷৶০ আনা পৃথক্।

২। **শ্রীশ্রীগৌর-করুণার বৈশিষ্ট্য**

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ৪+১১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। বিনা রেজিষ্টরী বুকপোষ্টে ডাকমাশুল ⁄০ আনা পৃথক্। রেজিষ্টরীতে ।⁄০ আনা এবং ভি, পি, তে ।৶০ আনা অধিক।

৩। **শ্রীশ্রীগৌর-তত্ত্ব**

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ৮+১৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ টাকা। বিনা রেজিষ্টরী বুকপোষ্টে ডাকমাশুল ৶০ আনা পৃথক্। রেজিষ্টরীতে ।⁄০ আনা এবং ভি, পি, তে ।৶০ আনা অধিক।

৪। **গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন** (শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া লেখা আরম্ভ করা হইয়াছে)

প্রাপ্তি-স্থান :—

১। **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ,**

৪৬, রসারোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন, পোঃ টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩

২। **মহেশ লাইব্রেরী,**

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা—১২

৩। **শ্রীগুরু-লাইব্রেরী,**

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

৪। **দাসগুপ্ত এণ্ড কোং,** ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২